KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৮/৭ ৪৮/৮ ৪৮/৯ ৪৮/১০ ৪৮/১১	Year of Publication : Nov 1987 Dec 1987 Jan 1988 Feb 1988 March 1988
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

মার্চ ১৯৮৮

"বাঙলা উপন্যাসে প্রগতিশিবির ঃ পিছিয়ে ভাবা আর এগিয়ে দেখা" নিবন্ধে ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় প্রগতিসাহিত্যের পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে প্রগতিশিবিরের উপন্যাস কেন ধারাবাহিক সাহিত্যস্রোত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ-নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন। □ এই উপমহাদেশে ইতিহাসচর্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক-দৃষ্টি-প্রণোদিত হওয়ায় জাতীয় সংহতি কিভাবে বারবার ব্যাহত হয়েছে এবং হচ্ছে, ব্যাপক তথ্যের ভিত্তিতে সেই সমস্যারই সূত্র সন্ধান করেছেন খাজিম আহমেদ "ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা" নিবন্ধে। □ ঔপনিবেশিক জনতত্ত্বে যাঁদের নাম "আদিবাসী" এবং গান্ধীবাদী দৃষ্টিতে "হরিজন", এই দেশের জনসম্প্রদায়ের সেই এক-চতুর্থাংশ মানুষ ৪০ বছরের স্বদেশী শাসনে যথার্থ "দেশবাসী" হয়ে ওঠার মর্যাদা কি পেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে কমলেন্দু ধরের রচনা "দেশবাসী আর আদিবাসী"। □ এখন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান আর কলা যেমন দুটি ধারা, ইংরাজি-মাধ্যম আর বাঙলা-মাধ্যমও সেইরকম সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ধারা। এই দুটি ধারা সমাজের মধ্যে গড়ে তুলছে বিচ্ছিন্ন দুটি সম্প্রদায়, একেবারে পৃথক দুই কালচার— মহাশ্বেতা চৌধুরীর উদ্বেগ-উদ্রেককারী আলোচনা ঃ "দুই সংস্কৃতি — দুই মেরু"।

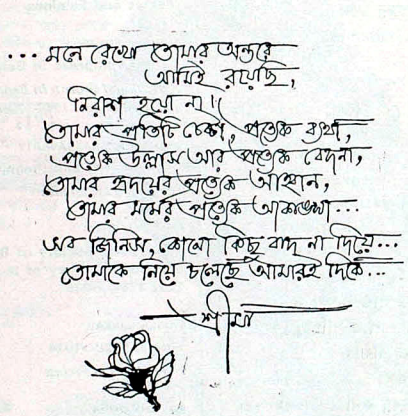

…মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা…
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে…
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে…

—শ্রীমা

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৮৮
ফাল্গুন ১৩৯৪

বাঙলা উপন্যাসে প্রগতিশিবির শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৯৫৯
ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা খাজিম আহ্‌মেদ ৯৭৫
দেশবাসী ও আদিবাসী কমলেন্দু ধর ৯৯৯
'জগৎ পরাধীন, কিন্তু মন স্বাধীন' শান্তনু কায়সার ১০১৩

আমি চাই মহাদেব সাহা ৯৬৭
নষ্ট প্রবেশ লুপ্ত প্রস্থান রবীন সুর ৯৬৮
হোক মতি মুখোপাধ্যায় ৯৬৯
তিনসন্ধ্যাকাল সমরেশ দাশগুপ্ত ৯৭০

চক্র ওয়াসি আহমেদ ৯৭১

গ্রন্থসমালোচনা ১০২৫
আজাহারউদ্দীন খান, রণেন্দ্রনাথ দেব, কান্তি গুপ্ত, অভিজিৎ করগুপ্ত

সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ ১০৩৭
"দুই সংস্কৃতি"—দুই মেরু? মহাশ্বেতা চৌধুরী

স্মৃতিচারণ ১০৪৬
হেমাঙ্গ বিশ্বাস রণেন্দ্রনাথ দেব

বিতর্ক ১০৪৮
বামপন্থী সাহিত্যচেতনা অভিজিৎ করগুপ্ত

মতামত ১০৫১
কেন টিউটোরিয়াল? তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

UNIT:

AUCKLAND JUTE MILLS

KANKARIA ESTATE
6 LITTLE RUSSEL STREET
CALCUTTA-700 071

Off. : 44-6267 / 43-2328 / 3-2492
Resi. : 44-7209 / 44-9768

Cable : SWANAUCK
Telex : 2396 AUCK IN

বাঙলা উপন্যাসে প্রগতিশিবির : পিছিয়ে ভাবা আর এগিয়ে দেখা

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

যামিনী রায় তাঁর সুনিপুণ পরিশীলিত দক্ষতায় লোকশিল্পের পটুয়ারীতির আদর্শে জীবনের অধিকাংশ ছবি আঁকলেও তুলনামূলক বিচারে অজন্তা আঙ্গিকের সচেতন প্রভাবাধীন শিল্পী নন্দলাল বসু তাঁর শিল্পকর্মে বিষয়ের দিক থেকে যামিনী রায়ের চেয়ে অনেক বেশি জনজীবনের কাছাকাছি এসেছিলেন। ছবির আঙ্গিকে আর শৈলীতে লোকশিল্পানুগত্য শেষ পর্যন্ত হয়তো বা আপাত-পরিচ্ছন্ন নাগর সংস্কৃতি-অভিজ্ঞান-সংগ্রাহক বা উন্নাসিক লোকশিল্পবোদ্ধার বৈঠকখানার সাংস্কৃতিক মানসংবর্ধনের উপকরণ হিসেবে প্রশংসিত হতে পারে, কিন্তু ধুলোমাটিতে হাঁটা মানুষের চোখে এবং মনে সহজাত ঐতিহ্যবাহী বা সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতাসম্পৃক্ত বিষয়ানুগত্য অনেক বেশি আত্মীয়-ভাবনার সঞ্চার ঘটায়। বিষয়বস্তুতে ট্রাডিশনবাহিতা বা পরিচিত জীবনের প্রাত্যহিকতার অনুষঙ্গে জীবন-চিত্রণের প্রয়াসে এক সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত মমত্ববোধ নন্দলালের ছবিকে অনেক বেশি জনগ্রাহ্য করে তুলেছে। যদিও এ স্বীকৃতিতে অনৃতভাষণ নেই যে ভারতীয় শিল্পের পর্যালোচনায় প্রগতিশিবিরে একদা (হয়তো বা এখনো) নন্দলালের চেয়ে যামিনী রায়কে অধিকতর জনমুখী মনে করা হয়েছিল।

শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রগতিচিহ্ন খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রায়শ মোটা দাগের রক্তহীন নিম্নবৈত্তিক ভাষণের অনুকৃতিতে বিভ্রান্ত হয়েছি, খুঁজেছি বাস্তব-জীবনে অনুপস্থিত মনগড়া লড়াইয়ের উচ্চকিত বর্ণাঢ্য পরিস্থিতি, যা আমাদের নিরুপদ্রব বৈঠকখানায় আরাম-সুরক্ষিত জীবনে ঈষৎ উত্তেজনার পরিমিত নেশা উদ্রিক্ত করতে পারে। নন্দলালের নিষ্ঠায় যাঁরা সাধারণ মানুষের আপাতম্লান জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনীতে জীবনের প্রতি আমাদের সাগ্রহ মমতাকে সজীব রেখেছেন, তাঁরা অনেক সময় প্রগতিশিবিরে যথাযোগ্য সুবিচার পান নি। উপন্যাসের প্রগতিশিবির প্রেমচন্দ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেনেছে ঠিকই, তবে তা বোধ হয়, প্রেমচন্দের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তিম প্রবন্ধ "মহাজনী সভ্যতা"র খাতিরে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কমিউনিসট পার্টির প্রতি তাঁর সক্রিয় সহমর্মিতার কারণে। নইলে "প্রেমচন্দ গান্ধীবাদী লেখক" এমন-কি "প্রেমচন্দের উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব" নিয়ে অনেক অশিক্ষিত দায়িত্বহীন উক্তি বহুকাল বিনা

প্রতিবাদে প্রচলিত থাকত না। এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে সেই বহুজনস্বীকৃত পণ্ডিতপ্রবর সমালোচকের উক্তি: "উদ্ভট সমস্যার আরোপ", "অসংলগ্ন অবাস্তবতা", "ছেলেদের জন্য ট্রয়নগরী ধ্বংসের এক গ্রাম্য সংস্করণ", "মহাকাব্যের ঝুমুরগানে পরিণতি" বা "উদ্ভট কল্পনাপ্রবণতা বাস্তবনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা"—এ-সবের খণ্ডনে আমরা এতদিনে যথাযথ পরিশ্রম স্বীকার করতাম। একদিকে প্রেমচন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এই ঔদাসীন্য, অপরদিকে জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণের মতো মাটিছোঁয়া সাহিত্যিকের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে প্রগতিশিবিরে এখনো যেন দ্বিধাকুণ্ঠার অবসান ঘটে নি।

সনেটে বা মহাকাব্যে যেমন একটা নির্দিষ্ট ফর্‌ম্ আছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই। তার একটা কারণ উপন্যাসের সূচনা শিল্পপিপাসার খাতিরে নয়, জীবনজিজ্ঞাসার তাগিদে। জীবন অর্থে নিঃসন্দেহে মানুষের জীবন—যার নিজস্ব কোনো বাঁধা ফর্‌ম্ নেই।

মানুষ বোধ করি দু ধরনের প্রসঙ্গ শুনতে বা পড়তে চায়। এক ধরন হল কল্পনাভিত্তিক অবাস্তব অবিশ্বাস্য—যা মানুষ পায় নি পাবে না, দেখে নি দেখবেও না, হয় নি হবেও না—সেইরকম অবিশ্বাস্য একটা কিছু। প্রাচীন মহাকাব্যে যে আদর্শায়িত চরিত্র আছে, মোটা দাগের উজ্জ্বল বা প্রবল ঘটনা আছে, তাও অনেকটা সেইরকম। কোনো কালেই তা ঘটে নি। মানুষ তবু ভাবে হলে কেমন হত, এবং সেই কল্পনার রূপকল্পনার সুযোগ করে দেয় অবাস্তব কাহিনী রূপকথা বা মহাকাব্যে। দ্বিতীয় ধরন হল যথাযথ বাস্তব-জীবননির্ভর। এ ধরনের ব্যাপারে মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে পারে। এই বাস্তব-জীবননির্ভর রচনা থেকেই উপন্যাস। যত বিশ্বস্ত তত সার্থক। উপন্যাস অতীতে রচিত হয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। জীবনের জটিলতা থেকেই উপন্যাসের উদ্ভব। মানুষের জীবনে জটিলতা এল যেদিন ঈশ্বর বা ধর্ম মানুষের জীবনকে লাগামবাঁধা ঘোড়ার মতো যথেচ্ছ পরিচালনা আর করতে পারল না সেদিন থেকে। আধুনিক মানুষের জীবনে এল এই ঈশ্বর বা ধর্মীয় নির্দেশের হাত থেকে স্বাধীনতা। মানুষ কী করবে বা কী হবে, তার ভাগ্যনির্ধারণের পূর্বনির্দিষ্ট ছকটা দৈব বিধানের হাত থেকে মানুষের নিজের হাতে এল। ফলে তার জীবনে এল জটিলতা। আজকের দিনেও এমন মানুষ আছে যারা দৈব বিধানকে এখনও মান্য করতে চায়, তারা উপন্যাসের ভিতর দিয়ে জীবন দেখতে পায় না, এখনও পুরাণের গল্প শুনতে ভালোবাসে। মহাকাব্যে কুটিলতা নিষ্ঠুরতা আছে, জটিলতা নেই। মন্থরা শকুনি কুটিল, কৈকেয়ী দুঃশাসন নিষ্ঠুর, কিন্তু জটিল নয়। জটিলতার সূচনা বোধহয় দৈবনির্দিষ্ট ছক ভাঙার বিদ্রোহে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আত্মবিশ্বাসের অপরিমেয় সাহসে, যা প্রাচীন জীবনে ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

আধুনিক পরিভাষায় যাকে উপন্যাস বলা হয় তার দুশো বছর পার হয়ে গেছে। এবং এই দুশো বছরে উপন্যাসের সংজ্ঞা নিয়ে কম তর্কবিতর্ক হয় নি। কেতাবি তর্ক যাঁরা করেন সার্থক উপন্যাসের নজির নির্ণয়ের দায় তাঁদের হাতে নেই, যাঁরা উপন্যাস রচনা করেন পাঠকের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠার দায় তাঁদেরই। এবং একটি বিশেষ সমাজ-আশ্রিত পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার দায় থেকেই উপন্যাসকে বারে-বারে পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত হতে হয়েছে। উপন্যাসে যতই-না ব্যক্তিজীবন বা চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, যেহেতু সে ব্যক্তি সমাজ-আশ্রয়-নিরপেক্ষ নয়, সে কারণে উপন্যাসের লেখককে সমাজের গতি-প্রকৃতি বা গঠনের প্রতি উদাসীন থাকতে দেয় না। উপন্যাসের এক অবশ্য-পালনীয় শর্ত সামগ্রিকতা এবং সেই সামগ্রিকতার স্বার্থেই উপন্যাস সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না। এবং সেই কারণেই উপন্যাসে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার শিবির সহজে নির্ণীত। বাঙলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত সমসাময়িক সমালোচনায় এ প্রসঙ্গ স্পষ্টত উচ্চারিত হয় নি। তখন উপন্যাস বিবেচিত হত ভালো এবং মন্দ, সুলিখিত এবং কুলিখিত, বা আধুনিক এবং অনাধুনিক—এই নিরিখে। যদিও ১৯৩৪ সালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস "চার অধ্যায়" প্রকাশের পরেই ভালো-মন্দ বা সুলিখিত-কুলিখিতের চৌহদ্দি পেরিয়ে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন শোনা গেল। বাঙলা উপন্যাসের প্রগতিশিবির তখনও সুদূরপরাহত। এমন-কি প্রগতিচিহ্ন সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতাও আসে নি শিল্প বা সাহিত্যের কোনো মহলে।

ইতিহাস ব্যাপারটিকে সনতারিখের হিসেব নিয়ে চলতেই হয়। যে ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সম্মেলনের প্রথম সমাবেশ, সেই বছরেই প্রেমচন্দের মৃত্যু। সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষত প্রগতিশিবিরে সেদিন উল্লসিত হবার মতো তেমন কিছু ঘটে নি। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র (১৯২৬) গা-ঘামানো দেশপ্রেমের উষ্ণ উত্তাপ সত্ত্বেও তাকে প্রগতিশিবিরের শরিক বলে দাবি করা হয় না। বরং তার তিন বছরের মধ্যে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" (১৯২৯) প্রগতিশিবিরে আজ নতুন করে আলোচনা দাবি করতে পারে। তারও তিন বছর পরে তারাশঙ্কর তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন শুরু করলেন "চৈতালি ঘূর্ণি" (১৯৩২) দিয়ে। এবং তারও তিন বছর পরে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"-এর এক বছর পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস "দিবারাত্রির কাব্য" (১৯৩৫)। প্রেমচন্দের চেয়ে আটাশ বছরের ছোটো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুতুলনাচের ইতিকথা" আর প্রেমচন্দের "গোদান" প্রকাশিত হয় একই বছরে (১৯৩৬)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে-বছর শুরু হল সেই ১৯৩৯ সালে দেখতে পাই বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" আর তারাশঙ্করের "ধাত্রীদেবতা" প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার বছরখানেকের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শহরতলী" (১৯৪০-৪১)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপকূলে এসেও বাঙলা উপন্যাসে কোনো আসন্ন বৃহত্তর সংকট বা সমস্যার আভাস কার্যত অনুপস্থিত। মনে রাখা ভালো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বলাকা-পর্বের কবিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালেও রবীন্দ্রনাথে তার যে আভাস ধ্বনিত হল, তা সেদিনের বাঙলা উপন্যাসে বহুল পরিমাণে অনুপস্থিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শহরতলী"ই তার মৃদুস্পন্দন হলেও স্পষ্ট ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা তার পরবর্তী দশ বছরের বাঙলা উপন্যাসে যুদ্ধের অভিশাপ, কালোবাজারি, দুর্ভিক্ষ, কলকাতার ফুটপাথে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ছাত্রবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ বা উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে একেবারে কিছু লেখা হয় নি বললে ঠিক বলা হবে না। তারাশঙ্করের "মন্বন্তর" বা সুবোধ ঘোষের "তিলাঞ্জলি"কে ব্যতিক্রম বলা ঠিক হবে না কখনোই। কিন্তু এরা কেউই ক্লাসিকের আসন দাবি করবে না। তথাপি, এই অভিজ্ঞতা—যা নাকি এক শতাব্দীতে দুবার পুনরাবৃত্ত হবার নয়, তা নিয়ে বাঙলা উপন্যাসে তেমন ক্লাসিক রচিত হয় নি, তা অনস্বীকার্য। জয়নুল আবেদিনের এবং চিত্তপ্রসাদের ছবি, বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটক বা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "নবজীবনের গান", এমন-কি সলিল চৌধুরীর "কোনো এক গাঁয়ের বধূ"র দোসর তো দেখা গেল না বাঙলা উপন্যাসে। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ গণবিক্ষোভ দাঙ্গা বা উদ্বাস্তু নিয়ে কালজয়ী উপন্যাস রচনার শর্ত হতে পারত লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সংবেদনশীলতা এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সামাজিক-আর্থনীতিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার সমন্বয়ে, দুর্ভাগ্যবশত এই সমন্বয় ঘটে নি সমসাময়িক কালে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের যথার্থ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে সম্যক আগ্রহ আজও প্রগতিশিবিরে আছে কি না সে অপ্রিয় তর্ক আমাদের বিষণ্ণতাই বাড়ায়, সমাধানে পৌঁছিয়ে দেয়

না। অথচ আমরা সবাই জানি এবং মানি যে ইতিহাসের এই ঘাগুলি এখনো আমাদের সামাজিক শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে শুকোয় নি। ১৯৩৯ সাল থেকে যার শুরু, সেই অস্পষ্ট বা বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ অথবা বিশ্লেষণ-বিমুখতা প্রগতিশিবিরে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আমাদের প্রগতির গতিকে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করেছে। সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা, ১৯৪১ সালের ২২ জুনের পর জনযুদ্ধ ঘোষণার ফলে জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে আসা, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাধিকার আন্দোলন সমর্থনের সূত্রে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি অস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা, ৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিভ্রান্তিকর অথচ অনতিক্রম্য প্রভাব সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা, পরবর্তী কালে নির্বাচনাশ্রিত প্রত্যাশা আর অসম জোটবন্ধন এবং সত্তর দশকের সূচনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে চীন-রুশ বিরোধ এবং দেশাভ্যন্তরে উগ্র বামমার্গী বিপ্লবায়োজনের আকস্মিক প্রবল চাপে বিশ্লেষণের পরিবর্তে আত্মরক্ষার তাগিদ আমাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপ্রবণতাকে বারে-বারে আচ্ছন্ন করেছে। প্রগতিশিবিরের বাঙলা উপন্যাসও এর খেসারত দিয়ে চলেছে।

উপন্যাস যেহেতু চরিত্রনির্ভর এবং সে চরিত্র বাস্তবজীবনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ফলে চরিত্রের বিবর্তনপথে বিবৃত হয় একটি জীবনচিত্র। এবং এই জীবনচিত্রকে সামাজিক পটভূমিকার নিকষে যাচাই করে নিতে হয় বলেই উপন্যাসের চরিত্রের সূত্রে যা প্রতিপন্ন হয়, তাকে বলা যায় জীবনসত্য। এবং এই বিচারেই ক্রাইম-নভেল, ডিটেকটিভ, অ্যাডভেন্চার, সায়েন্স্-ফিকশন, এমন-কি রোমান্স্ মূলত কল্পনা-প্রধান বলেই উপন্যাসের মর্যাদা পেতে পারে না। ঔপন্যাসিককে যেহেতু সামাজিক কাঠামোকে স্বীকার করে বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে চরিত্রকে গড়ে তুলতে হয়, সে কারণে কোনো সার্থক ঔপন্যাসিক জীবনের রিপোর্টার মাত্র নন, জীবনসত্যের স্বার্থে তাঁকে কোনো-না-কোনো পক্ষাবলম্বন করতেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তির আহ্বান জানিয়েছেন, রূপমোহের সর্বনাশা পরিণতি দেখিয়েছেন, নারীকে সংসারধর্মে নিষ্ঠাবতী হতে উপদেশ দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত গীতায় বর্ণিত আদর্শ গৃহীরই পক্ষাবলম্বন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ "গোরা" উপন্যাসে তাঁর কল্পিত ভারত-পথের প্রতি এবং অন্যত্র আদর্শ মানবিকতার প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রই নির্যাতিত নারীশ্রেণীর হয়ে সামাজিক পক্ষাবলম্বন করলেন। এই সামাজিক পক্ষাবলম্বনের ধারাই শেষ পর্যন্ত প্রগতিশিবিরে অনুসৃত।

ধূর্জটিপ্রসাদ বা অন্নদাশঙ্কর বিভিন্ন প্রবাহ, ধারা বা কৌশলের ক্ষমতাশালী প্রবর্তক হয়েও বাঙলা উপন্যাসকে গড়েপিটে তৈরি করতে তাঁদের কোনো ভূমিকা আছে, একথা ইতিহাসে স্বীকৃতি পায় নি। বরং স্টীম অব কনশাসনেস পরবর্তী কালে অনেক চতুর জীবনবিমুখ উপন্যাসলেখকের সুরক্ষিত দুর্গ হয়ে উঠেছিল—এ নিতান্তই দুর্ভাগ্যের। বরং দুই পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক বিশ্বাসের পটভূমিকায় রচিত গোপাল হালদারের "একদা" এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী" পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসকে অনেক বেশি সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছে। যদিও এ দুটি উপন্যাসও সেই স্টীম অব কনশাসনেসের পথানুসারী। কেবল জীবনধর্মিতায় এবং জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাসে উপন্যাস দুটি বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। "একদা" বা "জাগরী"-র নায়ক পরবর্তী সংকটে এসে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এ প্রশ্ন সাহিত্যের প্রশ্ন নয়। তবে উভয় নায়কই আদর্শ-উদ্বুদ্ধ চরিত্র, যে আদর্শবোধ বাঙলা উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ অনুবৃত্ত নয়।

উপন্যাস বা সেই বিচারে কোনো সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মই রচয়িতার সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তি-প্রতিভার একান্ত পরিণাম নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উপস্বত্বভোগী ধনীর দুলাল যদি বা ইতিহাসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে অনুপার্জিত বিত্তের বিনিময়ে জীবনের চর্ব্যচোষ্য ভোগ করে যেতে পারে, সাহিত্যিকের পক্ষে এমন কোনো অনুপার্জিত গৌরবভোগের উপায় নেই। তাঁকে অভিজ্ঞতার বিনিময়ে প্রাপ্ত জীবনসত্যকে ইতিহাসের হাতে রেখে যেতে হয়। ইতিহাসের বিচারকে এড়িয়ে চলার উপায় নেই। আঙ্গিকসর্বস্বতা বা সংলাপের চমকপ্রদ প্রসাধন পাঠককে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করলেও, উপন্যাসের চরিত্রের পটভূমি এবং বিবর্তন, সেই সঙ্গে উপন্যাসের গতিপথে বিশ্লেষণী গভীর ভাবনাই উপন্যাসের যথার্থ নির্ণায়ক শক্তি। উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে সংলাপের চমক, বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য, গঠনের অভিনবত্ব ততখানি জরুরি নয়, যতখানি জরুরি ঔপন্যাসিকের জীবন-অভিজ্ঞতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ইতিহাসের প্রতি দায় এবং ভবিষ্য প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব। সাহিত্যের যে-কোনো বিভাগেই শেষ পর্যন্ত এই শর্তগুলি অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। তবে উপন্যাসের চরিত্রকে যেহেতু কাল-নিরপেক্ষ গগনচারী করে দেখানো অসম্ভব, সেখানে সময় এবং পরিবেশের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে থাকা বা সময় এবং পরিবেশের সম্যক ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সৎ ঔপন্যাসিক সময় এবং পরিবেশের ভূমিকা অস্বীকার করতে পারেন না বা চান না বলেই তাঁকে যত বেশি সম্ভব বিশদ বিবরণের সূত্রে পাঠকের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে হয়। তবে যেখানে ইতিহাস আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতি ঔদাসীন্য সুপরিকল্পিত, সেখানে উপন্যাসের স্বাদ এবং লক্ষ্য ভিন্ন হতে বাধ্য।

জীবন মানুষ ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ বাদ দিয়ে যে-উপন্যাস রচনার প্রয়াসে আজকের এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী, এমন-কি তরুণ লেখকগোষ্ঠীও, কী নিদারুণ বিভ্রান্ত হয়ে চলেছে বাজারের বহুবিক্রীত পত্রিকা বা উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তার প্রবণতা আর পরিণাম উপলব্ধি করা যায়। উপন্যাস-রচনাকে যখন নিছক একটা প্রসাধনকুশল শিল্পকর্ম হিসেবে দেখা শুরু হয়, জীবন-অভিজ্ঞতার নামে যেখানে এক তাৎক্ষণিক ভোগসর্বস্ব আদর্শহীনতার রঙিন ফানুসের প্রতি আকৃষ্ট করে জীবনের সংজ্ঞাকেই বিকৃত করে দেওয়া হয়, সেখানে বাণিজ্যসফল ঔপন্যাসিকের সংজ্ঞা নির্ণীত হয় তাঁর আকর্ষণী শক্তির অর্থাৎ নেশাধরানোর যোগ্যতা বিচারে। এবং তাঁকে শক্তিমান লেখনীর দোহাই পেড়ে প্রতিষ্ঠার মিনারে চড়িয়ে দেওয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠা বস্তুত সমকালের বাজারে নগদ-বকশিশ—আসরে বসে যেন বাইজীর মুজরোর ইনাম। এ-পথে কোনো ঔপন্যাসিক হাঁটবেন না এমন একরারনামা লিখে দেবেন না অনেকেই। সাহিত্যের, এবং সেই সূত্রে সমাজের, স্বাস্থ্যের চেয়ে যদি কেউ ব্যক্তিস্বার্থকে বলবত্তর করে দেখেন, তাহলে ইতিহাসের দিকে চেয়ে এইটুকুই বলতে পারা যায় যে ব্যক্তিস্বার্থ নশ্বরদেহের মতোই কালসীমাজয়ী নয়, ফলে ইতিহাসের দাক্ষিণ্য থেকে এ-জাতীয় ঔপন্যাসিকেরা বঞ্চিত থাকবেন সুনিশ্চিত-ভাবে।

প্রগতিশিবিরে সংশয় অভিমান ক্রোধ খুবই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় যে সমরেশ বসুর মতো ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার বিকৃত রসায়নের বিনিময়ে মানুষের প্রতি তাঁর বহুমূল্যবান মমতার পাত্রখানি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। যতখানি অস্বস্তিকর লাগে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, এমন-কি রমাপদ চৌধুরীর দ্বিধাকুণ্ঠিত পদক্ষেপে বা অহেতুক প্রসাধন-কুশলতার কাছে পরাভব স্বীকারে, হয়তো ততখানি হয় না সন্তোষকুমার ঘোষ বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এমন-কি গৌরকিশোর ঘোষের ক্ষেত্রে, যখন বুঝতে পারা যায় যে স্বার্থবুদ্ধির প্রণোদনে তাঁরা সচেতন সিদ্ধান্তেই বিরোধী শিবিরের অভিভাবকত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত।

সাময়িক বাজারে জনাদর আর প্রকাশকের

লাভের অঙ্কের বিচারে বাঙলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে গেলে নৈরাশ্যের সমূহ কারণ রয়েছে। পাঠকের দোহাই পেড়ে দায় এড়ানো যায় না। পাঠককে গড়ে তোলার লড়াইয়ে প্রগতিশিবির তার দায়িত্বপালন করতে পারে নি কেন, তাও বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ক্ষমতাবান সাহিত্যিকের অনেকেই একদা প্রগতিশিবিরের সহযাত্রী ছিলেন, অনেকে পরবর্তী কালে প্রগতিশিবিরের সঙ্গে সে একাত্মতা অনুভব করেন নি, অনেকে শিবির ত্যাগ করে সরাসরি বিরুদ্ধ ধারার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এর পিছনে সমাজকাঠামোতে যে শক্তি ক্ষমতারূঢ় তাদের সচেতন ষড়যন্ত্র বহুলাংশে দায়ী নিশ্চয়ই, কিন্তু তার পরেও, প্রগতিশিবিরের পিছনে যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা প্রতিনিয়ত প্রগতিশিবিরের ঔপন্যাসিককে উৎসাহিত করবে তার অনেকখানি দায়িত্ব থেকে যায়। সমসাময়িক কালকে অবক্ষয়ের কাল বলে চিহ্নিত করেও দায় শেষ হয়ে যায় না। ক্ষমতাসীন শক্তির ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ সমাজ অর্থনীতি বা রাজনীতির শিক্ষার্থীর না জানার কথা নয়। অবক্ষয়ের কারণ যেখানে সমাজব্যবস্থার অনেক গভীরে, তখন সমাধান যে সুলভ হবে না, তাও তো জানা। তবু এর মাঝেও যাঁরা অবক্ষয়কে নিয়তিস্বরূপ মেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান নি, আমাদের ভরসাস্থল তাঁরাই।

কিন্তু সেখানেও অস্বস্তিবোধ করতে হয় যখন দেখা যায় নেশাধরানো সফল সাহিত্য-বাণিজ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক ইশতেহারের ঢঙে চড়া সুরে আশাবাদের যান্ত্রিক জয়ধ্বনিতে পরিণতি ঘটিয়ে উপন্যাস রচনা প্রগতিশিবিরে নন্দিত হয়। তখন মনে হয় এ ট্রাজেডি কি প্রগতিশিবিরে কোনো দিনই ঘুচবে না! ক্ষমতাবানেরা পরিখা ডিঙিয়ে বিরোধী পক্ষে আর মমতাবানেরা যথার্থ রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অভাবে এবং সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রতি অনীহাবশত বাস্তবতার পসরা নিয়েও জীবনসত্যে পৌঁছতে পারছেন না। সৌরি ঘটকের উপন্যাস এক সময় প্রগতিশিবিরে সযত্ন প্রশ্রয় পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কৃষ্ণ চক্রবর্তী বা তপোবিজয় ঘোষ তাঁদের সযত্ন নিষ্ঠা সত্ত্বেও অনেক সময় সাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত এঁদের রচনায় অনুপস্থিত—এ সত্য দুর্ভাগ্যজনক হলেও, অগত্যা-স্বীকার্য। এঁদের উপন্যাসে প্রগতি সম্বন্ধে যতখানি আনুগত্য আছে, ততখানি সচেতনতা নেই গোরকি লু সুন প্রেমচন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-বোধের প্রতি।

১৯৫৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। তারপর তিরিশ বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি। এই তিরিশ বছরেই প্রকৃতপক্ষে অন্য শিবিরে সাফল্যের বন্যা ডেকেছে। তার একটি কারণ এই সময় থেকেই ওই শিবির তার দুর্গরক্ষায় পরিকল্পিতভাবে সচেষ্ট হয়েছে। এই পরিকল্পনার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে উপলক্ষ করে "শিল্পীর স্বাধীনতা" আন্দোলনে। সেদিন যাঁরা প্রকাশ্যে খাতায় নাম লেখালেন, তাঁদের ফিরে আসার কোনো দায় রইল না, কারণও ঘটল না। প্রগতিবিরোধী শিবিরের এই পরিকল্পিত অভিযানের বিরুদ্ধে এ শিবিরে তেমন সংঘবদ্ধ উদ্‌যোগ নেবার সুযোগ পাওয়া গেল না সেদিন। কিন্তু তার দায় বর্তাল দীর্ঘদিন পর্যন্ত।

এই অপ্রস্তুত অবিন্যস্ত প্রগতিশিবিরের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য নয়। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের উল্লেখ করতেই হয়। বিশেষত যাঁরা এই অনির্দেশের কালে স্থিতধী থাকবার চেষ্টা করছেন, তাঁরা ভবিষ্যতের সুদিনে বিশেষ সংবর্ধনার পাত্র হয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই। বলে রাখা ভালো যে এই পর্বের প্রগতিরেখা একান্তই খণ্ড ছিন্ন, এবং নিত্য-উর্ধ্বগামীও নয়। যদিও নিত্য-উর্ধ্বগামিতাই হল প্রগতির প্রাথমিক শর্ত। উপন্যাসের দিকে তাকালেই এই সিদ্ধান্ত আরও অধিক অগত্যাস্বীকার্য হয়ে পড়ে, যদিও ছোটোগল্পে ততটা নয়। কেননা ছোটোগল্পে একটা অল্প পরিসরের মেজাজ ধরা পড়ে, উপন্যাসের কাছে আমাদের

প্রত্যাশা লেখকের সামগ্রিক চিন্তাপ্রাবীণ্য।

গুণময় মান্নার "লখিন্দর দিগর", "কটাভাঙারি" বা "জননী" পশ্চিমবাঙলার গ্রামকে যেভাবে উপন্যাসে চিত্রিত করেছিল তা পূর্বঐতিহ্যরহিতও বটে আবার এর অনুসৃত্যিও দেখা গেল না পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসে। এমন-কি তিনি নিজেও পরবর্তী কালে "জুনাগড় স্টীলে" শ্রমিকজীবনচিত্রণে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। গুণময় মান্নার স্বল্প রচনা তাঁকে ইতিহাসে স্থান দিলেও, কোনো নতুন ধারার নেতৃত্বে তাঁকে আমরা দেখতে পেলাম না।

"গড় শ্রীখণ্ডে"র লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার উপন্যাসের মূল সূত্রকে ধরে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের পটভূমিকায় যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তিনি আজও সেই ধারারই অনুসরণ করে চলেছেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে হয়তো কখনো তিনি পাঠকের ধৈর্যকে কিঞ্চিৎ পীড়িত করেছেন। বর্ণনা-ভঙ্গির একটি শিথিল জটিল পদ্ধতি পরিহার করতে পারলে মনে হয় অমিয়ভূষণ এখনো প্রগতিশিবিরের এক সার্থক ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পাবেন। যদি না অধুনাতন পরীক্ষানিরীক্ষার পাকদণ্ডীতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

"তৃতীয় ভুবনে"র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী যদি অকালে স্তব্ধ না হত, তাহলে প্রগতি-শিবির এক সার্থক ঔপন্যাসিকের জন্য দীর্ঘকাল গর্ববোধ করতে পারত নিশ্চিতভাবে। ননী ভৌমিক বা সুশীল জানার প্রসঙ্গও উল্লেখ্য। তবে এঁরা কেন যে প্রগতি-আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে পারলেন না, তার আলোচনা একটি ভিন্ন আয়োজন দাবি করে। ভাবতে অবাক লাগে, "পাকা ধানের গান"-এর রচয়িত্রী সাবিত্রী রায় এবং "রঙরূটে"র বরেন বসু বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে প্রায় অনুল্লিখিত নাম।

অসীম রায়ের "একালের কথা", "গোপালদেব" এবং "আবহমান" অথবা "দেশদ্রোহী এবং "শঙ্খের গাঁচায়" উপন্যাস হিসাবে সম সার্থকতা অর্জন না করলেও এর কয়েকখানি দলিলধর্মিতা এবং রাজ-নৈতিক সচেতনতার বিচারে বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে প্রগতিশিবিরের অনুকূলধর্মী বলেই চিহ্নিত। সমকালসচেতন অসীম রায় যখন ইতিহাসের কোনো বিশেষ শতক নিয়ে তাঁর উপন্যাসের আয়োজন করেন তখন তাঁর সচেতন সদাজাগ্রত মনকে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে সমাজের যে স্তরের মানুষকে তিনি এক গৌরবময় মর্যাদা দিলেন, আমাদের আর্থনীতিক সমাজব্যবস্থার এক অনস্বীকার্য নির্মম সত্যকে উপন্যাসের আঙিনায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার জন্য প্রগতিশিবিরে মহাশ্বেতা দেবীর আসন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও তিনি অঞ্চলের প্রতি ততখানি সনিষ্ঠ নন যতখানি ভূমি-ব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপের প্রতি।

"পূর্বপার্বতী"র প্রফুল্ল রায় যদি যথার্থই বিহারের ক্ষত্রিয়- এবং ব্রাহ্মণসমাজ -শোষিত হরিজন ভূমি-দাসের জীবনে সনিষ্ঠ থাকেন তাহলে তাঁর কাছে প্রগতিশিবিরের প্রত্যাশা করবার মতো অনেক কিছুই থাকবে। অন্যথায় হয়তো বা তিনি তথাকথিত জন-প্রিয়তার তাগিদে আপননিষ্ঠাবিচ্যুত হয়ে যাবেন।

প্রগতিশিবিরের অপর আলোচ্য নাম অমলেন্দু চক্রবর্তীর। এ যাবৎ তিনখানি উপন্যাস নিয়ে তিনি পাঠক-দরবারে হাজির হয়েছেন। এরই মধ্যে তাঁকে বিষয়নিষ্ঠ এবং বিবেকবান ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ ঘটেছে। অমলেন্দু চক্রবর্তী শহরের মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রথম এবং তৃতীয় উপন্যাস "গোষ্ঠবিহারীর জীবন-যাপন" এবং "যাবজ্জীবন"-এর নায়ক এই শহরের চেনা মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। দুই নায়কের ক্ষেত্রেই ছকে এক সাদৃশ্য-বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম সাক্ষাতে একজন তাঁর মাসের মাইনে খুইয়েছেন, অপরজন হারাতে চলেছেন তাঁর সুনাম। এই দুই

বিপর্যয়ের জন্যই নায়কদ্বয় সচেতনভাবে দায়ী নন। এবং সেখান থেকেই জটিলতার সূত্রপাত এবং দুই পথে দুই উপন্যাস পা বাড়ায়। অমলেন্দু চক্রবর্তীর নিষ্ঠা তাঁর বর্ণনানৈর্ঘ্যতে, তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতায়। তিনি রোমান্সের রঙিন ধোঁয়ায় জীবনের যুক্তিকে অস্পষ্ট করে দেন নি। বরং কোথাও-কোথাও তাঁর টুকরো-টুকরো ছবি শিল্পী-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করলেও উপন্যাসপাঠককে বিব্রত করে তোলে। যদিও ওই ছবি-গুলিই তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার শিকড়, একথা মেনে নিলে উপন্যাসপাঠকের সাধুবাদ থেকে তিনি বঞ্চিত থাকেন না। প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে একজন গড়েতর কেরানিকে পাঠক-সমাজের সামনে দাঁড় করিয়ে লেখক যে সাহস দেখিয়েছেন তা কেবল চমক সৃষ্টির তাগিদে নয়, চরিত্রের প্রতি যে মমত্ববোধ প্রগতিশিবিরের লেখকের পয়লা নম্বর শর্ত, তারই প্রয়োজনে।

আশির দশকে যদি কোনো প্রগতিশিবিরের ঔপন্যাসিক চল্লিশের দশকের "আকালের সন্ধানে" গ্রামে গিয়ে হাজির হন এবং সেই হাজির হওয়ার পিছনে একটি চলচ্চিত্রনির্মাণের তাগিদ হয়তো উপন্যাসের পক্ষে জরুরি ছিল, কিন্তু সেই আকালের দলিল প্রস্তুতের তাগিদ এতদিন কেন আমরা অনুভব করি নি সে প্রশ্নটাই অনেক বড়ো হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। যে জীবন-অভিজ্ঞতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রগতি-শিবিরের ঔপন্যাসিকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি যাঁদের রচনায় নানাভাবে উদ্ভাসিত তাঁদের স্বীকৃতিতেই প্রগতিশিবির তার হারিয়ে-যাওয়া গৌরবকে ফিরে পাবে—এ বিশ্বাস সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলি নিয়ে এসেছে। এই অবক্ষয় এবং বিভ্রান্তির মুহূর্তে এইটুকু আমাদের মূল্যবান সম্বল। প্রগতিশিবিরের বাঙলা উপন্যাস তার আদর্শ হিসেবে বিদেশে গোরকি বা লু সুন স্বদেশে প্রেমচন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকেই গ্রহণ করুক-না কেন, আপন জীবন-অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণক্ষমতার উপরেই তাঁকে দাঁড়াতে হবে। মানুষকে ভালোবেসে মানুষের ভালো ভেবে সাহিত্যসৃষ্টির আয়োজন সত্ত্বেও বারে-বারে সাহিত্য কেন যে বিপথগামী হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-জীবনের মোহ লোভ বা বিভ্রান্তি বিশ্লেষণেই কাজ ফুরোয় না। আমাদের সমাজব্যবস্থার সহস্র জটিলতার ভিতরেও মানুষের অনিবার্য উত্তরণে বিশ্বাসকেই শেষ পর্যন্ত মূলধন করতে হয়। মানিক-পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ীর "ঢোঁড়াই চরিত মানস" থেকে অতি সম্প্রতি কালের অমলেন্দু চক্রবর্তীর "গোঠবিহারীর জীবন-যাপন" বা "যাবজ্জীবন" পর্যন্ত সেই অনিবার্য উত্তরণের সম্ভাবনাকে উদ্দীপিত রেখেছে। এবং সেখানেই ভরসা করতে ইচ্ছা করে যে প্রগতি-শিবিরের বাঙলা উপন্যাস এই ধারাতে বারে-বারে সঞ্জীবিত হবে।

আমি চাই

মহাদেব সাহা

আমি আজ প্রাণখোলা অট্টহাসি চাই
বৈশাখের ঝড় চাই, উদ্দামতা চাই।
ফিসফিস কানাকানি চাই না মোটেও,
যার যা বলার খুবই স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে বলা চাই।

অশ্রু ও আর্দ্রতা নয় আজ আমি খর চৈত্র চাই
সেতু ভেঙে আজ চাই দীর্ঘ ব্যবধান,
আজ শুধু দূরত্ব চাই নৈকট্য চাই না
চাই না শীতল ছায়া, চাই দগ্ধ রৌদ্রের দুপুর।

আজ চাই শক্ত মাটি, ইট-কাঠ, লোহা
কাদামাটি, ঘাস-ফুল, এসব চাই না,
আজ আমি সমুদ্রগর্জন চাই, জলোচ্ছ্বাস চাই
ওলোট-পালোট-করা ভূমিকম্প চাই।

আকাশের মতো খোলা বুক চাই
দুরন্ত সাহস আর অফুরন্ত প্রাণাবেগ চাই,
পাহাড়ি নদীর সেই তুমুল ক্ষিপ্রতা চাই
উত্তাল তরঙ্গ চাই, বিস্ফোরণ চাই।

আমি চাই অধিক বিরহ আজ, মিলন চাই না
বন্ধন চাই না কোনো, মনপ্রাণে স্বাধীনতা চাই,
কোনো ঘোমটা চাই না আর, খোলামেলা দেখাশোনা চাই
চাই না সামান্য স্থিতি, আজ চাই অনন্ত সাঁতার।

বাংলাদেশ

নষ্ট প্রবেশ লুপ্ত প্রস্থান

রবীন সুর

গরম ভাত মাছের ঝোল বৈঠাউলি গ্রাম
গাছতলাতে খাওয়া
পথের ধারে কুঁড়েঘরটি একা
পেঁপের চারা সবে যুবতী ফল ধরেছে বুকে
সরল চোখ উদোম দেহ হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা
ওদিকে খেত সর্ষেফুল হর্ষে উঠে হাওয়া
বাঁকিয়ে মাজা ঢেউ খেলছে দুপুর এলোচুলে
শহর ছেড়ে নদী পেরিয়ে বৈশালীর কাছে
নাম-না-জানা গ্রামের দিকে আলের সিঁথি সোজা।

কজন বয়স্ক আছে ভিন্ন ভিন্ন নিজের পৃথিবী
নিজ দুর্গে স্বেচ্ছাবন্দী। ঝকমারি সংসারে দুদিন ছুটির
চেষ্টিত উজান বেয়ে গুণটানা, আনন্দকে কোনোক্রমে ছোঁয়া!
নান্দনিক স্পর্শবিন্দু রম্যক্ষণে ছুঁতে-না-ছুঁতেই পিছনের
ন্যানজারি যত ছিল, শিশুসুখ পূর্ণিমা চাঁদের হাসিমুখ
ঢেকেছে চিন্তার মেঘে। বুকে এক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরের
অজ্ঞানতা মূলধন অগ্রপশ্চাতের চিন্তাযুক্ত ছায়া নেই—
চাঁচি-শুদ্ধ, ভ্রমণের দুধ খেয়ে আহ্লাদের উজ্জ্বল ফোয়ারা
না-বুঝে থাকার সুখ পড়ে আছে কতদিন তোরঙ্গের নীচে।
গোমড়া-মুখ মুখোশের ঘামে ভেপসে পিছু ফিরে দেখি।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা পড়ো-পড়ো
ওপরে ত্র্যম্বক স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যের ভাং ভোম চাঙ
এবং পায়ের নীচে আঁকাবাঁকা কোমর নাচানো
নারী নাকি নদীটির ছলাকলা আদিম শরীর
যতখানি ছাখানো সম্ভব জ্বেলে দিয়ে ঋদ্ধ পুরুষের
কাছাকাছি থেকে বলা যায় আছি আছি…
মরণ নিশ্চিত জেনে ঝুঁকে-পড়া বুনো ডালপালা
যতটা ধ্বংসের মুখে উগ্রপ্রেমে, তার চেয়ে বেশি
আমিই এগিয়ে যাই হাঁটু মুড়ে ফেনিল স্রোতের
স্বেচ্ছায় অতিথি হতে, বারংবার পাথর পেশির অবয়ব
সঙ্গম সংঘর্ষে ধ্বস্ত, নুড়ি নুড়ি, অন্তিমে বালির সোনামাথা;
ভবিষ্যৎ সর্বনাশ আছে জেনে অতি ভয়ংকর
রমণে ভরেছি দৃশ্য যতদিন তুমি আছ তরাই তরুণী।

হোক

মতি মুখোপাধ্যায়

যে পারে সে তুলে নিক কালো
মাটির ভিতরে ক্রমে-ক্রমে
পৌঁছাক আলো।

জমাট পাথরগুলি কতদিন থেকে
জমাট পাথর হয়ে আছে।

যে পারে সে ভাঙুক পাথর
পাথর-ছিদ্র-করা আলো
ভিতরবাড়িতে যেতে-যেতে
ভাঙচুর হয় যদি
হোক।

তিনসন্ধ্যাকাল

সমরেশ দাশগুপ্ত

ধারাপাতে যে অভদ্র অসুখ তার কোনো চাপমাত্রা নেই যে
সারস্বত জীবনযাত্রা বা অনুপুঙ্খ রক্তপাত থেকে উঠে
আসবে ভাটিয়ালি গানের মতো অভাবী নদীর কাল;
হাতে জলফোঁটার তুল্য ডাকটিকেট এলে কেই বা আমরা
বলে উঠি, সারা বিশ্ব এখন আমার রঙিন মুঠোয়।
বর্ণহীনতার অন্য নাম তবে গুলিবিদ্ধ সময় নাকি, তবু জানা হয়ে গেল
দুঃসাময়িক ধারাপাতে যে জ্বর তার কোনো নিজস্ব থারমোমিটার
নেই যে ব্রেল বর্ণমালার মতো সে হবে অন্ধবান্ধব।
অন্ধজনে দেহো আলো গান যে অসুখী যুবতী বিষণ্ণ
গেয়ে যায় সন্ধ্যাবেলা, তার ঘরে নেই কোনো
প্রাচীন হারমোনিয়ম, আছে শুধু পিতামহের স্মৃতিচিহ্ন
অরগানের মৃতদেহ। তবু জীবাণু শত্রুর কাছে নতজানু কেন
এই ঘোর তান্ত্রিক সন্ধ্যায়? আসলে সারস্বত জীবনযাত্রা-টাত্রা
বলে কিছু নেই ধারাপতনের ভেজা অসময়ে।
এবং যতই কুমারী গেয়ে যাক অন্ধজনে দেহো আলো—
অরগানের মৃত্যুর জন্য কোনো শোকগাথা নেই এই
সুবন্ধ সন্ধ্যায়। তবু যুদ্ধের আগুন থেকে কেই বা উঠে এসে
বলবে: আপেল খাওয়ার সময় অনেক পাবে, এই ঘোর তিনসন্ধ্যাকালে
বরং চলুক রুদ্রাক্ষের শবসাধনা, যে সাধনার মূল তন্ত্র মৃত অরগান।

চক্র

ওয়াসি আহমেদ

আলোটা একটু আগে ছিল রোমশ জানোয়ারের মতো।

ঘরের ভেতর হাওয়া আছে কি নেই। নীচু এইটুকু সিমেনটের ছাদের কোণ ঘেঁষে ঝুলঝুলে তারের ডগায় ন্যাড়া বাল্ব। আলোর উপস্থিতি ছাড়া ঘরে আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। এই ঘরে এখন সে শোয়া-মাথাটা বালিশে চিতকরা; আদতে বালিশ হলেও সেটি এখন গাছের গুঁড়ি কিবা ঘাটলার পাথর-দুখানা পা-ই সামনে ছড়ানো; চোখের ভেতর, শরীরের রক্ত-মাংস-ঝিল্লির পরতে-পরতে, খুলির গর্তে অসংলগ্ন, ভেদাভেদহীন দিনরাত্রি।

চোখ খুলতে গিয়ে সে বাধা পায়। সে অনুভব করে তার আধা-আধা চোখের পাতা থেঁতলানো পটকা মাছের মতো চেপে বসে আছে। ভুরু কুঁচকে বার কয়েক চেষ্টা করে সে। আঙুল দিয়ে ঘষবে বলে একমাত্র সচল ডান হাতটা উঠিয়ে কপালে রাখে, অমনি যেন-বা অবলীলায় বাঁ চোখটা অল্প ফাঁক হয়ে যায় তার, তাতেই লতানো আলোর সাপটা তাকে গেঁথে ফেলে। দুঃসহ আলোর ঘূর্ণিতে নিজেকে সঁপে দিয়ে সে একসময় অন্য চোখটাও বিচি ছাড়ানোর মতো খুলে ফেলে। তখুনি সে বুঝতে পারে তার এই চোখটাও গেছে।

এত আলো কোথা থেকে আসছে সে আন্দাজ করতে পারে না। তার মনে হয় না এখন রাত, বেশ রাত এবং সে যেখানটায় পড়ে আছে সেটি একটি ঘর কিবা ঘরের মতো। বরং সে ভাবছে এখন খাড়া দুপুর; সে শুয়ে আছে ধূ-ধূ মাঠের মাঝখানে, চিত হয়ে শোয়ায় আকাশের সূর্যটা অবধারিতভাবে লটকে আছে তার কপালে। হালকা একটা হাওয়া আছে, সূর্যটা দোল খাচ্ছে হাওয়ায়, আর সেই সাথে দুরন্ত পালের মতো ফুলে ওঠা রোদটাও। আশ্চর্য, তাপটা টের পাচ্ছে না সে। হলুদ, অফুরন্ত রঙের সমারোহে ডুবে যাচ্ছে সে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ণাঢ্য রঙের বৈভব ছড়িয়ে পড়তে থাকে তার চারপাশে। যেন-বা তার

মাথাটাই এখন ঝলমলে মাঘী সরষের বাহারি বাগান। ঝাঁঝালো রঙের গন্ধ তার নাকে। আলোটা সয়ে আসতে থাকে চোখে।

পাশের ঘরে ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা চলছে। ক্যাসেট-প্লেয়ারে মৃদু একটা রিনরিনে আওয়াজ কথার ফাঁকে-ফাঁকে মাথা তুলেই ছাইচাপার মতো ধিকিধিকি আছে তো আছেই। কে যেন বলল, বাতিটা নেভা। কে হতে পারে? মেয়েলি গলা, ঝাঁঝ আছে। জাহানারা না, তার গলায় এত জোর কোথায়? তাহলে, টিপুর বউ? টিপুর বউই হবে, মেয়েটার গলায় আজকাল জোর বেড়েছে, সারাদিন বাড়ি মাথায় করে রাখে, কাজে-অকাজে যাকে-তাকে শাসায়, এমন-কি জাহানারা-কেও। কাল রাতে কি টিপুর বউ এসে দাঁড়িয়েছিল মশারির পাশে, অমন চোরের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে কিছু একটা খুঁজছিল। ভয়ে তার বুক কাঁপছিল। বলা যায় না, টিপুর বউ কাউকে বুঝতে না দিয়ে তাকে মেরেও ফেলতে পারত। বললাম না বাতি নেভা। আশ্চর্য, জাহানারার গলা! টিপুর বউ কি ঘরে নেই?

কার যেন ছুটো বিরক্ত পায়ের আওয়াজ উঠে আসে এবং একটু পরই তার মাথার পেছনে দেয়ালের সুইচবোর্ডে টুক করে শব্দ হতেই ঘরময় এত যে রঙের আকাশ, উদ্ভত সরষের মাঠ, এমন-কি সূর্যটাও উধাও হয়ে তাকে নিস্ব করে রেখে যায়। আলোহীন ঘরে শুয়ে-শুয়ে লোকটা ভাবে এখন শীতকাল—মাঘ না হলেও পৌষ কি কার্তিক, বাইরে কুয়াশা। সবে সন্ধে পার, উঠোন জুড়ে ডাঁই-করা মাড়াইয়ের ধান। পুকুরপাড়ে বারোমাসি পেয়ারা গাছে ঝুপঝাপ বাদুড়ের ডানাঝাড়া, হঠাৎ দূরে, বহুদূরে মারিতাড়ানো সমবেত জিকিরের ভয়ধরানো আল্লাহ্। তার শীত-শীত বোধ হতে থাকে। বহু বছর বেঁচে থাকার দীর্ঘ অভ্যাসবশত সে পাশ থেকে কম্বল টেনে গা ঢাকতে যায়। একমাত্র সচল ডান হাত দিয়ে সে এপাশ-ওপাশ নাড়ে, আর তাতে টের পায় তার পরনের শুধু-মাত্র গেনজিটাও ঘামে চুপসে আছে। বুকের লোম-কূপে, গলার খাঁজে, চিবুকে, গালের দাড়িতে, কপালের বলিরেখায় ভাঁজে-ভাঁজে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঘাম। সে তখন ভাবে এটা গরমেরই কাল, হ্যাঁ গরমের—মার্চ, এপ্রিল, জুন যে-কোনো একটা।

পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে যেদিন সে রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সেদিনটা ছিল মার্চ মাসের পয়লা তারিখ।

গা-জ্বালানো গরম ছিল সেদিন। স্ত্রীর হাত থেকে সকালবেলা পেনশনের রঙচটা মলিন বইটা পানজাবির পকেটে গোঁজার সময় তার মুখে হাসি ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা দূরে বাসস্টপ পর্যন্ত সে হেঁটে-হেঁটে গিয়েছিল। মাথার ওপর চড়া রোদ ছিল বলেই হয়তো, কিংবা হাঁটার তালে-তালে মাসপয়লা টাকা পাওয়ার অস্থিরতাজনিত কারণেও হতে পারে, তার শ্বাসকষ্টের মতো অনুভূতি হচ্ছিল। একটার পর একটা বাস তাকে ফেলে চলে যাচ্ছিল, ঠা-ঠা রোদে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল বাসে চাপার মতো তিল-পরিমাণ শক্তিও শরীরে নেই। আর তখনি মাথাঘোরা এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণগুলো প্রকট হতে থাকায় সে অসহায় যন্ত্রণায় আকাশভরা ক্ষিপ্ত, বর্ণচ্ছটাময় স্যুচালো হলুদ রোদ এবং ফুটপাতের ধুলোবালির মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। নিজেকে পুনরায় ফিরে পেতে তার অনেকটা দিন পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে তার দুখানা পা-ই গেছে, বাঁ হাতটা যাও-বা একেক সময় শূন্যে উঠে আকাশির মতো ভেঙে নুয়ে আসত—ক-দিনের মধ্যে তাও গেল। সবশেষে দুম করে একটা চোখও। চোখের ব্যাপারটা অবশ্য সব সময় খেয়াল থাকে না, যেহেতু অপর চোখ দিয়ে সে ঘুম কিংবা দেখা দুই-ই সারতে পারে।

মশারির বাইরে অন্ধকারে ছায়ামতো কী একটা দুলে উঠতে সে সচকিত হয়। গতরাতের ভয়টা তাকে পেয়ে বসে। সে অস্ফুটে, যেন-বা নিদারুণ মমতায় উচ্চারণ করে—বউমা! ছায়াটা এবার বাস্তবিক

মানুষের আকৃতি নিয়ে মশারির ভেতর তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, ভয় পেয়ে সে কাতর গলায় আবারো বলে—বউমা! আগন্তুক মেয়েমানুষটা ভেজা গামছা দিয়ে তার কপাল, চোখমুখ মুছে দেয়। একসময় আলগোছে অসাড় বাঁ হাতটা তুলে ধরে পরনের ভেজা গেনজিটা গা থেকে ছাড়িয়ে নেয়। তার বুকে, পেটে ভেজা গামছার পরশ বোলায়, তারপর ঘাড়ের নীচে কনুই পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে মাথাটা অল্প তুলে ধরে চামচে করে বিষতেতো ওষুধ খাওয়ায়।

খালি বউমা-বউমা কর কেন, কোনো দিন ধারে-কাছে আসত, না, খোঁজখবর রাখত? আপদ গেছে, শান্তিতে আছি।

লোকটা তার স্ত্রীর কথা বুঝতে চেষ্টা করে। ভেজা গামছার স্পর্শে তার মাথাটা হালকা মনে হয়। অন্ধকারে সে স্ত্রীর মুখ দেখতে পায় না, তবে বুঝতে পারে তার পাশে বসা এই মানুষটা সম্পূর্ণ সচল আর জীবন্ত। ইচ্ছে করলেই হাত-পা ছুঁড়তে পারে, মুখে কথার খই ফোটাতে পারে, এমন-কি তার মতো অচলকে দয়া-দাক্ষিণ্য পর্যন্ত। তার রাগ হয় না, দুঃখ হয় না, হিংসেও না।

তার স্ত্রী কথা বলে, যেন নিজেকে নিজে—বউ মরে যাওয়ায় ভয়ে-ভয়ে ছিলাম ছেলেটা না আবার বিগড়ে যায়। কত এমন হয়, বেঁচে থাকতে লাথি-ঝাঁটা আর মরে গেলে লোকদেখানো ভড়ং। টিপুটা ঠিকই আছে, আজকাল ঘরদোরের কত খোঁজখবর রাখে! কয়দিন ধরে মমতার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, ঝন্টুকে বলে আবার কলেজে যেতে। একটু দুধ খাবে?

সে জবাব দেয় না। সে ভাবছে অন্য কথা, টিপুর বউ মরে গিয়ে থাকলে কাল রাতে কাকে দেখল সে! এই মেয়েমানুষটা নির্ঘাত বানিয়ে বলছে এসব। তার দুর্বল বুকটা দ্রুত ওঠানামা করে। তার স্ত্রী উঠে গিয়ে দুধ নিয়ে আসে। চামচে করে তার মুখে ঠাণ্ডা দুধ দেয়। সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় খায়। তার স্ত্রী আরো কী সব বলে, ঠিক তাকে না, বিড়বিড় করে নিজেকে নিজে শোনায়। আগে কি তার স্ত্রী এমন ছিল? তার মনে হয় জাহানারা এখন আগের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী। সে স্ত্রীর মুখটা মনে আনতে চেষ্টা করে। স্ত্রীকে কোনোদিন ভালোভাবে লক্ষ করেছে এমন মনে পড়ে না তার, এখন দেখতে চাইলেও কি সম্ভব? একটাই মাত্র চোখ, সারাক্ষণ পানি জমে থাকায় ঘোলা-ঘোলা যেটুকু দৃষ্টি এখনো অটুট তাতে মেয়ে-মানুষের মুখ দেখবার যোগ্য কোনো বাড়তি দ্যুতিই ফোটে না। তবু তার মনে হয় জাহানারাকে দেখে। এই কথাটা ভাবতে গিয়ে সে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভব করে এবং চোখ মেলে চেয়ে দেখে ঘরে এবং ঘরের বাইরে খোলা জানালার ওপারে চোখজুড়ানো অন্ধকার। কেমন দেখতে এখন জাহানারা? আগের তুলনায় অনেক বেশি তৃপ্ত এবং সেই সাথে চতুরও? নিজের অক্ষমতা কিংবা পঙ্গুত্ব তাকে দুঃখী করে না, সে বরং আগের জাহানারার কথাই ভাবে। কী আশ্চর্য নির্বোধ ছিল জাহানারা! সেই একবার অনেক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় দুর্দান্ত ঘুষি চালিয়েছিল সে জাহানারার মুখে, তাতেও মেয়েমানুষটা টুঁ শব্দ করে নি। সেই তুলনায় আজ-কাল? দিনভর যা শোনে তা তার স্ত্রীরই গলা! টিপুর বউ আসবে কোত্থেকে? মরে যাবার পর থানা-পুলিশ, কত হাঙ্গামা—কী যেন নাম ছিল মেয়েটার ···মনোয়ারা। লোকে বলেছিল আত্মহত্যা; গ্যাসের চুলার আগুন—নিজে সাধ করে না লাগালে গায়ে লাগে কী করে?

এখন কয়টা বাজে? মনে-মনে এই প্রশ্নটা করতে চাইলেও অনেকটা সময় মুখের ভেতর লালা জমে থাকায় কথাগুলো অস্পষ্ট থেকে যায়।

স্ত্রীর মুখটা ঝুঁকে পড়ে তার মুখে—কী বলছ? শোনো, টিপু বলছে তোমাকে হাসপাতালে ভরতি করতে। শুনছ? হাসপাতালে। অন্ধকারে স্ত্রীর ঝুঁকেপড়া মুখটা তার নজরে আসে কিন্তু চারপাশের

অন্ধকার থেকে সে সেটিকে আলাদা করতে পারে না।

পাশের ঘর থেকে ভেজা স্পনজের চটাচট আওয়াজ তুলে কে যেন আসে।

—তোর বাপ তো কিছু বলে না, তবু মতটা নেয়া ভালো। আর কটা দিনই বা!

—মুশকিল তো, এই অবস্থায় নিতে চায় না। বলে খামোকা ঝামেলা করছেন, যে কয়দিন শ্বাস আছে বাড়িতেই ভালো।

—মাথা খারাপ তোর, মমতাকে দেখতে আসবে না সামনের শুক্রবার! মাত্র দুইটা ঘর, এই ঘরটা খালি থাকলে কত সুবিধা! কেন, হাসপাতালের কথা তো তুই-ই বললি!

—চেষ্টা তো আমি করছি, ওরা শোনে না, হাসে।

—হাসে মানে, কারা?

—হাসপাতাল, ডাকতার। বলে লাশ দাফন করতে চান না তো হাসপাতাল কেন, রাস্তায় ফেলে রাখলেই পারেন!

—ওরা এসব বলে আর তুইও শুনিস! নিজের বাপ বলে কথা, আমরা কি ফকির-মিসকিন? লাশ দাফন করতে কয়টা টাকা লাগে? তুই ওদের বোঝা।

—বোঝাতেই তো গেলাম, বলে—এ সময় চিকিৎসা-ফিকিৎসা হবে-টবে না, হাসপাতালে কেন দিতে চান?

—হাসপাতালে যেন মানুষ শুধু চিকিৎসার জন্যই যায়? তোকে বোঝাল আর তুইও বুঝলি! চিকিৎসার কথা তোলেই বা কেন ওরা, এ সময় চিকিৎসা!

—তবে?

—তবে আবার কী? বাপের টান দেখি বড়ো!

হালকা হাসির তরঙ্গ ভাসে টিপুর গলায়, টান আমার না তোমার, এত রাত বসে সেবা করছ!

—বাজে বকবি না টিপু! তুই আর তোর বাপ এক না; আমরা চল্লিশ বছর আছি একসাথে—আমাদের নিয়ে তোদের মতো দুনিয়া-জোড়া টিটি পড়ে নি। নিজের বাপ নিয়ে কথা বলতে লজ্জা হয় না?

—আমি কি তাই বললাম নাকি? বললাম এত রাত পর্যন্ত বসে আছ, টান আছে বলেই না।

—ইয়ারকি করবি না। টানের তুই কী বুঝিস, একটা বছর থাকতে পারলি না! মেয়েটা খারাপ কিছু ছিল না, না হয় একটু মুখ করত।

—এসব, এসব কথা কেন? ওর মরতে ইচ্ছা হয়েছে, ব্যাস।

—মরতে ইচ্ছা হয়েছে! ওর মরতে ইচ্ছা হল আর তুই গায়ে কেরোসিন ঢেলে বললি, যা মর্! বাহাদুর!

কথার পিঠে কথা। লোকটার কানে সব যায় না, যাও-বা যায় তাতে অস্পষ্ট, অর্থহীন, ক্ষীণ শব্দমালা বই কোনো সংলগ্ন রূপ সৃষ্টি হয় না। বরং এই শব্দরাজি তাকে এক ধরনের বধিরতা দান করে। আলো-অন্ধকার, শব্দ-নৈঃশব্দ্যের বাইরে দৃষ্টিহীনতায় এবং বধিরতায় সে ক্রমে-ক্রমে নিজেকে এবং পরিপার্শ্বকে অতিক্রম করে যেতে থাকে।

মৃত লোকটির পাশে তার স্ত্রী হুমড়ি খেয়ে হু-হু কাঁদে। তার বিলাপহীন কান্নায়, ক্রমান্বয়ে-দুলতে-থাকা শরীরের দ্রুত কম্পনে দুঃখ কিংবা বিষাদের চেয়ে মহৎ একটি তীব্র, নিশ্চিত লক্ষ্যভেদের ব্যর্থতাটুকুই মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে।

ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা

খাজিম আহ্‌মেদ

আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ এই আলোচনার মূল উপজীব্য নয়। এই দেশের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চা এবং ইতিহাস শিক্ষণের ভয়াবহ রূপটি নিরূপণের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিপন চন্দ্রের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের অন্যতম উপফল। মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের ভীতি, ঈর্ষা এবং হতাশাবোধ সাম্প্রদায়িকতা-নামক ঘৃণ্য মানসিকতাটিকে আজও টিকিয়ে রেখেছে।[১] বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বরুণ দে সহমত পোষণ করেন। তাঁর বিশ্বাস, এই হানাহানির বয়স মাত্র দুই শতাব্দী। বিপন চন্দ্র তাঁর "কমিউনালিজম ইন মডার্ন্ ইনডিয়া" বইটিতে পরিষ্কার এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে শোষণ করতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।[২]

"সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাসচেতনা"-নামক একটি মূল্যবান আলোচনায় অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'সাম্প্রদায়িকতা বলতে বুঝি—এবং চিরকালই বুঝেছি—হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই বিশেষ অর্থ কিছুটা কষ্টকল্পিত। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধমাত্রেই সাম্প্রদায়িক।'...... 'ঐতিহাসিকের কর্তব্য সেই জটিলতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা ও সেইমত বর্তমান অবস্থাকে উপস্থাপিত করা'।[৩] সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় মানুষ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। জাতীয় দুর্যোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার এবং তার রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় আর সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক অসাধারণ গবেষণা করেছেন।[৪]

ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি জটিল এবং তর্কপ্ররোচক বিষয়। সাম্প্রদায়িক চেতনা আর গোঁড়ামির বশবর্তী হলে ইতিহাসবোধ বিকৃত হতে বাধ্য। এই ইতিহাসবোধ আর অমার্জিত ইতিহাস

শিক্ষণপদ্ধতি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে গুরুতর ভূমিকা পালন করে থাকে। আজকাল এই তত্ত্বটি ক্রমশই গ্রাহ্য হয়ে উঠছে যে, সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন ইতিহাসচর্চা এই উপমহাদেশে বিভেদের এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী নেতারাও এই ভয়ানক সমস্যাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন। গান্ধী লিখেছেন, 'আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য একান্তভাবে কাম্য কারণ, অন্য বিষয় ছেড়ে দিলেও, স্বরাজলাভের জন্য এটা প্রয়োজনীয়।'[৫] তিনি এই বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চা এই দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনের মূল অন্তরায়।[৬]

বিকৃত ইতিহাসচর্চার প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লাজপত রায় "আত্মজীবনী"-তে লিখেছেন যে তাঁর শৈশবে সরকারি স্কুলগুলোতে "ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ"-নামে একখানি ভারত-ইতিহাস পড়ানো হত। এই কেতাবখানি পড়ার পর তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল এই গ্রন্থটি পড়ার পর তা ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়।[৭] মোহাম্মদ আলি "কমরেড" পত্রিকায় ভ্রান্ত আর মিথ্যে ইতিহাস পঠন-পাঠনের কুফল সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন।[৮]

জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সমস্যার কথা উপলব্ধি করেই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'কানপুর রায়টস্ এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করেন। কমিটি মনে করে, বিদ্যাপীঠগুলোতে পঠিত মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ গ্রন্থসমূহ 'is playing a considerable part in estranging the two communities'।[৯] পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ করে কমিটি আরও মন্তব্য করে যে, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রথম আর অপরিহার্য শর্ত আর কর্তব্য হল বিকৃত এবং উদ্ভট ইতিহাসগ্রন্থজাত ভুল বোঝাবুঝিগুলো দূর করা। সমাধান এই পথেই সম্ভব।[১০] এ সত্ত্বেও নিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিকযুক্তিনির্ভর ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার ওপর নির্ভর করে "দ্বিজাতি তত্ত্ব" প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য এবং স্বীকৃত হয়ে ওঠে এবং ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিদ্বেষের মধ্যে দেশ বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৪২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এই তরল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ব্রিটিশ রাজ খতম হলে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সম্ভব হবে। স্বাধীনতালাভের চার দশক পরেও দুই যুযুধান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য তো স্থাপিত হয়-ই নি, উপরন্তু সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এক ধরনের খণ্ডতা আর শূন্যতা-বোধ সমকালীন চেতনাকে ভয়ার্ত করে তুলেছে। ভারতের মতো বিশাল একটি বহুজাতিক দেশের পক্ষে এই অবস্থাটি যে কী পরিমাণ মারাত্মক আর ভয়ানক হতে পারে, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি! ধর্মীয় কারণে দেশবিভাগের পরেও বর্তমান ভারতে সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষবৃক্ষের মহীরূহে পরিণত হওয়ার কারণ হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আর ভেদবুদ্ধিতে জারিত ইতিহাসচর্চা।

"আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক ও সাম্প্রদায়িকতা"-শীর্ষক একটি রচনায় বিপন চন্দ্র এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 'আজকের দিনে একথাটা অনেকেই মানবেন যে গত একশো বছর সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের জন্যে ভারতে ইতিহাসশিক্ষা অনেকটাই দায়ী। প্রকৃত পক্ষে, একটুও অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে, ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই বরাবর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মতবাদকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিলে সাম্প্রদায়িক মতবাদের আর বিশেষ কিছুই বাকি থাকে না'।[১১] 'এটি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য'।[১২] নিদর্শন হল, ভি. ডি. সাভারকরের "হিন্দুত্ব", "হিন্দু রাষ্ট্র-

দর্শন" এবং এম. এস. গোলওয়াকারের "We or Nationhood Defined"।[১৩] হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রাচীন ভারতের তথা "হিন্দু ভারতের" যশোগানে মত্ত হলেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্ম-সংস্কৃতি, সংখ্যালঘিষ্ঠজাত ভীতি আর অস্বস্তিকাতরতার ওপর নির্ভর করলেন। বস্তুত উভয়-ধর্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করে ভীতি, মোহগ্রস্ততা, মানসিক অন্ধতা, ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

'সেক্যুলার অ্যানড সায়েন্টিফিক হিসট্রি' গবেষণার কথা আজকাল শোনা যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তক, ছাত্রছাত্রীরা যে-সমস্ত 'টেক্স্ট্ বুক' পড়ে থাকেন তার অধিকাংশই বিভেদাত্মক এবং রক্ষণশীল চিন্তাধারার ফসল। মুক্তমতি বুদ্ধিজীবী ইরফান হাবিব স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ইতিহাসচর্চায় অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভঙ্গির সঙ্গে প্রতিটি তথ্যপ্রমাণের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণও সমান জরুরি, নচেৎ অসম্পূর্ণতার জন্ম অবশ্যম্ভাবী'।[১৪]

লিখিত উপাদানের অপ্রতুলতা

প্রাচীন যুগের তথ্যাশ্রয়ী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হচ্ছে লিখিত উপাদানের অপ্রতুলতা। তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ অনিত্য জীবনের বিবরণ লিখতে উৎসাহবোধ করেন নি। অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবীয় পর্যটকরা ভারতপরিভ্রমণ শুরু করেন এবং তৎসংক্রান্ত ঐতিহাসিক রচনাগুলো প্রণয়নের সূত্রপাত হয়। এঁদের মধ্যে আবু রিহান মোহাম্মদ আল-বিরুনী ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর "তহকক-ই-হিন্দ" (কিতাবুল হিন্দ, 'ভারত অনুসন্ধান') অসাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ।

প্রাচীন ভারত সম্পর্কে আধুনিক রচনা এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। স্যার উইলিয়াম জোনস কর্তৃক 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পর প্রাচ্যভাষাচর্চা শুরু হয়। বিশেষত সংস্কৃত-ভাষা-অধ্যয়নকারীরা 'প্রাচ্যবাদী' বা 'ভারততত্ত্ববিদ' ('ওরিয়েন্টালিসট', বা 'ইনদোলজিসট') হিসেবে পরিচিত হন। 'প্রাচ্যবাদী'রা বৈদিক যুগের যশোগানে রীতিমত বিভোর হয়ে পড়েছিলেন। আর্যভাষীদের সংস্কৃতির ভক্ত এই শ্রেণী বৈদিক যুগের গুণগান করতে গিয়ে সবরকম পরিমিতিবোধ খুইয়ে বসেছিলেন। সেই গুণকীর্তন রক্ষণশীলদের শ্লাঘা এবং গৌরবের কারণ হয়ে উঠল, কেননা তাঁরা বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের ধর্মীয় মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরেজ পণ্ডিত হুইটন এই মানসিকতার বিচার করেই বলেছেন, 'The Rigveda contains the germ of the whole development of Indian religion and polity.'

১৮০৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জনৈক শিক্ষক ভারতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেটি হাস্যকর ইতিবৃত্তে পূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য কোনো সৃষ্টি নয়। ১৮১৮ সালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল রচনা করেন "হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইনডিয়া"। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে a book which was regarded as a standard authority in those days.[১৫] এই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেছিল। লর্ড হেসটিংস প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তাচ্ছিল্য করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে। কিন্তু প্রাচীন ভারতচর্চার মোড়টি ঘুরিয়ে দেন প্রাচ্যবাদী জোনস, প্রিনসেপ, কোলব্রুক, বথলিং এবং আরো অনেকে। বিশেষত ম্যাক্সমূলার, উইলসন, ফারগুসান এবং ভারতীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রচার করলেন, 'the glory and greatness of the ancient Hindus'.[১৬] ক্রমে এদেশের ইংরিজি-শিক্ষিত

পণ্ডিতরা স্বদেশের ইতিহাসচর্চা শুরু করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মতবাদের দিক দিয়ে ইতিহাসচর্চার তিনটি প্রধান ধারা লক্ষ করা যায়: প্রাচ্যবাদী, হিতবাদী এবং জাতীয়তাবাদী।

প্রাচ্যবাদী ধারা

প্রাচীন ভারতের যশোগানের তত্ত্বটির ব্যাপক উদ্দেশ্য-মুখী প্রচার দিয়েছিলেন ম্যাক্‌স্‌মূলার। তিনি এতই উৎসাহী ছিলেন যে তাঁর নামের সংস্কৃতায়ন পর্যন্ত করেছিলেন মোক্ষমূলর নাম গ্রহণ করে। ভারত-ইতিহাসের উদ্ভট তত্ত্ব এবং অভিসন্ধিমূলক তথ্যবিন্যাস আর সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার উদ্‌গাতা ব্রিটিশসাম্রাজ্য-বাদপুষ্ট প্রশাসক, ঐতিহাসিক আর প্রকাশকদের বিকৃত ইতিহাসচর্চা, এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূলেও রয়েছে এই ইতিহাসশিক্ষা। ফলত আইন-প্রণয়ন, প্রশাসন, সমাজ-আর্থ ক্ষেত্রে পক্ষপাত এবং বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা গেছে এবং যাচ্ছে।

ম্যাক্‌স্‌মূলারের পবিত্র কর্তব্য ছিল আর্যরক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ। জারমানিতে নাৎসিবাদ উত্থিত হয়েছিল আর্যরক্তের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাকে কেন্দ্র করেই। মিথ্যাচার এবং প্ররোচনামূলক তথ্যবিন্যাস ভারতের আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকরা নির্জলা সত্য বলে প্রচার করেছেন। এঁরা "ভারতবিদ্যা"-চর্চার নামে "হিন্দু ভারতের" জয়গানে মুখর হয়েছেন। প্রাচ্য-বাদীদের লেখা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অশেষ প্রভাবিত করেছে। এমন-কি উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন বৈদিক সংস্কৃতির আদর্শকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ভিত্তি বলে প্রচার করে। হীনম্মন্যতা থেকে নিজেদের উদ্ধার করার জন্য রোমান এবং গ্রীকদের তুলামূল্য ভাবতে থাকেন। অদ্ভুত বিষয়—এর আগে অশোককে পর্যন্ত কেউ জানতেন না। তিনি 'মহামতি' হিসেবে ইতিহাসে একটি স্থান পেলেন। বৌদ্ধধর্ম ও আদর্শ জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হল। ম্যাক্‌স্‌মূলার পাশ্চাত্যের সভাসমাবেশে পর্যন্ত বক্তৃতা দিলেন শুধুমাত্র তথাকথিত "হিন্দু গৌরবের" ওপর ভিত্তি করে। সর্বোপরি প্রাচ্যবাদীরা এবং তাঁদের এ-দেশীয় শিষ্যমণ্ডলী হিন্দু সমাজকে একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। এইভাবে সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলেই সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তিনটি মীথের উদ্ভাবক হচ্ছেন প্রাচ্যবাদীরা। এক. প্রাচীন ভারতে সর্বোচ্চ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এটি ছিল "স্বর্ণযুগ"। মধ্যযুগ হল "সার্বিক অধঃপতনের" এবং "নিরবচ্ছিন্ন পরাধীনতার যুগ"। মুসলমানদের আগমনের ফলেই এদেশের সু-উচ্চ সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মুসলমানরাই সব অনিষ্টের মূল। দুই. মানবসভ্যতার ইতিহাসে এদেশের প্রাচীন যুগ অতুলনীয়। বিজ্ঞানের উন্নতি এমন ছিল যে বিমান এবং পরমাণু বোমা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। রাজনীতি, সমাজনীতি, আধ্যাত্মিক তথা আত্মিক শক্তির জগতে ভারতবর্ষ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তিন. খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ হল বৈদিক যুগের আর্য সমাজ ও সংস্কৃতি। অরবিন্দ ঘোষ বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে 'অনাদি ও অনন্তের অনুভবের' ওপর প্রাধান্য আরোপ করেন।

এই মীথের ওপর নির্ভর করার ফলে ঐতিহাসিকরা সমাজের দুর্বলতা স্বীকার করতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন না। এই উপকথাগুলো বহুজাতিক ভারতবর্ষে সাম্প্র-দায়িকতা সৃষ্টিতে বারুদের মতো কাজ করেছে। কেননা এতে অন্যান্য জাতিসত্তাকে উপেক্ষা আর অস্বীকার করার ঝোঁক পুরোমাত্রায় ছিল। এই উপকথাগুলো আজও সমান ক্রিয়াশীল। বিপন চন্দ্র খোলাখুলি বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে ইতিহাস-এর অপব্যবহার সংশোধন করার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করতে গেলে আমাদের এইসব উপকথাগুলিকেও ধ্বংস করতে হবে।'[১৭]

হিতবাদী ধারা

হিতবাদীরা (Utilitarian) হলেন উনিশ শতকের একদল প্রভাবশালী ব্রিটিশ দার্শনিক; বিশ্বাস করতেন এদেশে ব্রিটিশদের আগমন দৈবানুগ্রহের (providential) সঙ্গে তুল্য, কেননা এর ফলে ভারতীয়রা কুসংস্কারমুক্ত হবেন, স্বেচ্ছাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন-ধারা অবলুপ্ত হবে, রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠবেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, শাসকগোষ্ঠী এবং প্রকাশকরা প্রচার করেছিলেন যে ভারত চিরকাল অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। (Indian people had always been ruled by cruel tyrants and uncontrolled despots).[১৮] ফলত ব্রিটিশ শাসনও যদি স্বৈরাচারী হয়, দোষের কিছু নয়। উপরন্তু ব্রিটিশ শাসন জনকল্যাণকামী এবং তাঁরা আইনের শাসন স্থাপন করেছেন। মুসলমানরাও ব্রিটিশদের মতো বিদেশী। শুধুমাত্র ব্রিটিশরাই বিদেশী শাসন স্থাপন করেন নি। তাঁরা বর্বর, নির্দয় এবং নিষ্ঠুর শাসকদের পরিবর্তে "করুণাঘন সভ্য শাসন" উপহার দিয়েছেন। হিন্দুদের মুসলমান শাসনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। ফলত তাঁদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত। হিতবাদীরা আরও মন্তব্য করেন যে, হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের প্রতি যুযুধান সম্প্রদায়, তৃতীয় পক্ষ ছাড়া তাঁরা শান্তিতে বাস করতে অপারগ হবেন। এই কারণের জন্যেই ব্রিটিশ শাসনের অবস্থান অপরিহার্য।[১৯]

হিতবাদী জেমস মিল ছিলেন এই মতবাদের উগ্র প্রবক্তা। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাথমিক বিভাগটি করেছিলেন জেমস মিল তাঁর "দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইনডিয়া"-গ্রন্থে। তিনি "হিন্দু সভ্যতা", "মুসলমান সভ্যতা" এবং "ব্রিটিশ সভ্যতা" (খ্রীষ্টান সভ্যতা নয়) —এই তিন পর্বে ভাগ করেন। উক্ত গ্রন্থটি ভারত-ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনা করেছিল এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক সমর্থন জুগিয়েছিল। "ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস"-এর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ দিক বোধহয় এটিই। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা কোনো প্রশ্ন না তুলে এই পর্ববিভাগ মেনে নেন। এই পর্ববিভাগের মূলে ছিল শাসকগোষ্ঠীর ধর্মের পরিবর্তন। মিল তথাকথিত "হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির" ঘোর সমালোচক ছিলেন। রমিলা থাপার লিখেছেন, 'মিলের ইতিহাসের আর-একটি দিক হল হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে বিরূপতা। তিনি একে বর্ণনা করেছেন পশ্চাদ্-মুখী এবং প্রগতি ও যুক্তির পরিপন্থী হিসেবে। তিনি যার নাম দিয়েছেন "মুসলমান সভ্যতা" সে বিষয়ে তিনি একটু বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যদিও সে সম্পর্কেও তিনি কখনো-কখনো বিরূপ সমালোচনা করতে ছাড়েন নি।'[২০] ফলত প্রাচ্যবাদী এবং পরবর্তী কালের কিছু-কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক "হিন্দু সভ্যতা" তথা "হিন্দু ভারত" নামক আইডিয়াটিকে এই দেশের সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করলেন।

বিশ শতকের প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও প্রাচীন ভারতের গুণগানে মত্ত হন। প্রাচ্যবাদীদের মতো তাঁরাও, প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা প্রচ্ছন্ন রেখে একটি কল্পিত আদর্শের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা ছিল। উপরন্তু ভারতবর্ষের সব দুর্ভাগ্যের জন্যে মুসলমানদের আগমনকে দায়ী করেন তাঁরা। এর উপাদান হিসেবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করেন সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্র এবং আচরণের তাত্ত্বিক সূত্রগুলোকে, কেননা তাঁরা ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ। সংস্কৃতভাষাচর্চার অধিকার শুধুমাত্র তাঁদেরই ছিল। এই সূত্রগুলোর বিশ্লেষণ

তাঁরা করেন নি।[২১]

আধুনিক জাতীয়তাবাদের বহু বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ভারতেও বিদ্যমান ছিল, এমন অবাস্তব কল্পনাও প্রাধান্য পেতে থাকে। কিন্তু এটি তো ইতিহাসের সত্য যে খ্রীপূ ৬০০ থেকে ৫০০ খ্রী পর্যন্ত বহু বিদেশী এদেশ আক্রমণ করেছেন এবং দেশীয় নৃপতিদের পরাজিত করেছেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও জেমস বিলের পর্যবিভাগ সম্পর্কে মোটেই ভাবিত ছিলেন না। কেননা তাঁরাও সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে শাসকবর্গের কালানুক্রমিক বর্ণনা করতে আগ্রহী ছিলেন। রাজার ইতিহাস যেন দেশের ইতিহাস। রাজন্যধর্ম যেন সমস্ত দেশের ধর্ম। স্বাভাবিক কারণে "হিন্দু সভ্যতা" "মুসলমান সভ্যতা"—এমন তত্ত্ব তাঁদের পছন্দসই হয়। "মুসলমান সভ্যতা"কে তুচ্ছ করে "হিন্দুগৌরব" কীর্তন প্রাধান্য পায়। অথচ তুর্কী অভিযানকালে হিন্দুশক্তির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁরা কোনো প্রশ্নই তোলেন না। পুরো "মুসলমান সভ্যতা" ছিল অধঃপতনের কাল এবং তার ফলেই নাকি এদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছে—এমন কথা ভেবেও অনেকে তৃপ্তি বোধ করেন।[২২] এখনও "মুসলমান যুগ"-কে বর্বরতার মূর্ত প্রতীক হিসেবেই চিত্রিত করে থাকেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকরা। মুসলমানদের বলা হয় 'murdering hordes', 'murderous bands', 'despoilers', 'free-booters', 'the enemy', 'old invaders and foes' ইত্যাদি।

ভারতীয় ইতিহাসের অনুশীলনে এবং ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। রমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন, 'ইদানীংকালের সাম্প্রদায়িক ভাবধারা পরীক্ষা করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তা প্রাচীন ইতিহাস থেকে বুদ্ধিগত সমর্থন খুঁজছে।'[২৩]

সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত ইতিহাসচর্চা কিভাবে বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস আর একপেশে ধারণা সৃষ্টি করে চলেছে—সেই বিষয়টি খুবই সংক্ষেপে খতিয়ে দেখা যাক :

বিকৃত ইতিহাস

'মনে করা হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ তা হল হিন্দুযুগ, কারণ তখন সমস্ত উপমহাদেশের শাসকবংশগুলি হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু রাজবংশের ইতিহাসের ভিত্তিতেও এ যুগকে হিন্দুযুগ মনে করা সঠিক নয়, কারণ মৌর্য, ইন্দো-গ্রীসীয়, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু প্রধান রাজবংশই অ-হিন্দু ছিল। অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ এবং হিন্দুবিদ্বেষী না হলেও তাঁরা সচেতনভাবে নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতেন। তাহলে কি আমরা মনে করব যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সাল থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি বৌদ্ধযুগ-ও ছিল? আজকের ভারতে যদি যথেষ্টসংখ্যক বৌদ্ধ থাকতেন, তাহলে হয়তো এ ধারণাটিও স্বীকৃতি পেত।'[২৪]

"হিন্দু" শব্দটিও অর্বাচীন। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বতক "হিন্দু" শব্দটি অজ্ঞাত ছিল। আরবীয় মুসলমানরাই "হিন্দ" দেশে যাঁরা বাস করেন তাঁদের বর্ণনা করতে গিয়ে এই শব্দটি প্রয়োগ করেন। "হিন্দু" শব্দটি জাতিবাচক ছিল না এবং তাঁরা ঐক্যবদ্ধ একটি সম্প্রদায়ও ছিলেন না। বৈদিক, মৌর্য বা গুপ্ত যুগের ভারতবাসীর কাছে "হিন্দু"—এই সংজ্ঞাটির কোনো তাৎপর্য ছিল না। রমিলা থাপার লিখেছেন, 'আজকের দিনে আমরা যাকে হিন্দু বলে স্বীকার করি অতীত যুগে তার প্রায় কোনো পরিচয়ই মিলবে না।'[২৫] উনবিংশ শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা তুর্ক-আফগান পূর্ববর্তী রাজত্বকাল এবং এদেশের বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মানুষকে "হিন্দু" হিসেবে চিহ্নিত করে।

"বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতি" বলে কিছু নেই—এই সত্যটি অনেকেই স্বীকার করতে চান না। আর্য জাতির অস্তিত্ব এবং আর্যসভ্যতা সংক্রান্ত বিষয়টি আজ চ্যালেনজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আর্যসভ্যতার যাঁরা গৌরবকীর্তন করতে চান, তাঁরাই ভারতবর্ষকে আর্যদের বাসভূমি বলে প্রচার করেন। আর্য সংস্কৃতিকে "দেশজ" সংস্কৃতি তথা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মূল হিসেবে চিত্রিত করে ভূয়ো জাতীয় অহমিকাকে লালন করেন। বৈদিক সভ্যতাও সম্পূর্ণত ভারতীয় ছিল না। আর্যসভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার এই যশোগানের অর্থই হল সনাতন হিন্দু-ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। আর্যত্বের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী ঐতিহাসিকরা এই প্রশ্নে 'racist theory'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি কী? ইরফান হাবিব পরিষ্কার করেছেন এইভাবে, 'একজাতি জন্মগতভাবে অন্য বা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী এই ধারণা। এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চিন্তায় সহজেই ধরা পড়ে।'[২৬] আর্যদের জীবনযাত্রার সঠিক বর্ণনা করতে গেলে তৎকালীন সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা জরুরি। তাহলেই আমরা স্বীকার করতে পারব যে আর্যরা গোমাংসভক্ষণ ও মদ্যপান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রায় একশো বছর আগে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং হাল আমলে ভোলা চট্টোপাধ্যায় তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত ধারণা এতই বদ্ধমূল যে আজকের দিনে তা কেউই বিশ্বাস করতে চান না।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য হিসেবে "অহিংসা"র প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়, সেটিও সঠিক নয়। তৎকালীন নৃপতিদের রাজনৈতিক এবং সামরিক নীতিতে অহিংসার কোনো স্থান ছিল না। অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, কনিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষ, দ্বিতীয় পুলকেশিন্, মহেন্দ্রবর্মণ, পল্লব, রাজেন্দ্র চোল প্রমুখ বীরদের যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেটি রণবিজয় এবং রক্তপাতের দ্বারা অর্জিত। তাঁরা ধর্মের নাম করেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করেছেন, স্বধর্মী শত্রুদেরও বিনাশ করেছেন। এর মধ্যে অহিংসার স্থান কোথায় বোঝা মুশকিল। অহিংসাতত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শনের ফল। সেটি সুপ্রমাণিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম-ও ভারতবর্ষে বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে উৎখাত হয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর সামরিক অভিযানের পর অশোকের বোধোদয় হয় এবং অহিংসার বাণী প্রচার করতে তিনি উৎসাহী হন। অশোক ধর্ম-বিশ্বাসে শেষপর্যন্ত আর "হিন্দু" ছিলেন না। শুধুমাত্র রাজন্যবর্গের আচরণেই যে অহিংসানীতি অনুপস্থিত ছিল, তাই নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চার্বাকপন্থীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। চার্বাক এবং লোকায়ত দর্শনের পুঁথিপত্র বিস্ময়করভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এই বস্তুবাদী দর্শনের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ তাঁরাই (চার্বাকপন্থী) প্রাচ্যের বাস্তববাদী সত্যজ্ঞানের প্রবক্তা। এই দর্শনের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পেয়েছি বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক সাহিত্য থেকে। হিংসা ব্যতিরেকে কি মহাভারতের যুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল?

বুদ্ধদেবের কিছু আগে থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। লোকায়তিক বা চার্বাকপন্থীদের ব্রাহ্মণ্যবিরোধিতা চরমে উঠেছিল। চার্বাকপন্থীরা বেদের রচয়িতাদের ভণ্ড, ধূর্ত আর নিশাচর বলে আক্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি দার্শনিক মতবাদ, নৈতিক আদর্শ এবং জীবনচর্যা প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের আঘাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বুদ্ধ জন্মগত জাতিপ্রথাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তিনিই ছিলেন 'হিন্দু ভারতের প্রথম বিপ্লবী সন্তান'। ঐতিহাসিকরা এই বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কেননা কল্পিত 'হিন্দু ভারত' ও 'হিন্দু-সংস্কৃতির' ছকে এই ধর্মান্দোলনগুলির সাযুজ্য ছিল না। এগুলোর আধুনিক মূল্যায়ন করতে হলে তথাকথিত "হিন্দুগৌরব" বিপন্ন হয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আর ইতিহাস-পড়ুয়ার মনেও কোনো

জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে নি।

সর্বপ্রথম আক্রমণকারী ছিল বিদেশাগত আর্যরা অথচ তাদের স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে ভাবতে শিখেছি, অথচ এ-দেশীয় আদিবাসীরা ঘৃণ্য নিম্ন-শ্রেণীর জীব হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এরাই বৈদিক-সভ্যতা-যুগের শূদ্র। চিরকাল শোষিত হয়েছে উর্বর জমির ওপর বসবাসকারী আর্যরা ভারত-সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। বর্ণভেদ, জাতিভেদ "হিন্দুধর্মের ইস্পাত কাঠামো"র ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঠিক-ব্যাখ্যা-নির্ভর ইতিহাস রচনা করা হয় নি। কিন্তু ইতিহাস কোনো অন্ধতার দাসত্ব করে না। বৌদ্ধধর্ম জয় করেছিল গোটা এশিয়ার চিত্তভূমি। ব্রাহ্মণ্যবাদের ঘোরতর বিরোধিতা এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্বের ফলেই সেই আদর্শ এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছিল। "অহিংসা"-আদর্শের কোনো প্রকাশ আমরা লক্ষ করছি না।

আধ্যাত্মিকতা প্রাচীন ভারতের দর্শনচিন্তার মূল ভিত্তি—এমন কথা নিরন্তর প্রচারিত হয়ে চলেছে। অখণ্ড অবসরে অনন্তের ধ্যান—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সত্যিই কি সম্ভব ছিল? এমন কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপচে পড়ে নি যে সকলে ধ্যানস্থ হয়ে নির্ভেজাল সত্যের সন্ধান করেছেন। উপরন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এমন দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকার অধিকার ছিল শুধুমাত্র রক্তের সুবাদে উচ্চ শ্রেণীর। শোণিত ছিল সামাজিক মর্যাদার তুলাদণ্ড। ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা, হৃদয়হীনতা, পুরোহিতসমাজের ব্যক্তিজীবনের কদাচার এবং ভণ্ডামির প্রতিবাদেই বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের উত্থান ঘটেছিল। ভোগী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে নি। বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের প্রচারকরাই সহিষ্ণুতার ধারণাটি প্রচার করেছিলেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার স্খলনের বিরুদ্ধেই "চার্বাক"-পন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের দর্শনচর্চা শোষণেরই নামান্তর—এ সম্পর্কে পণ্ডিতরা নীরব। চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজে চতুরাশ্রমভিত্তিক জীবনধারা নিরবচ্ছিন্ন ছিল—এটি সত্য নয়। বর্ণাশ্রমবিভক্ত সমাজে সুনীতি, সুবিচার অবান্তর। অথচ অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকে এই মন্তব্য করা হয়ে থাকে 'ভারতের মহান আধ্যাত্মিকতার জন্য আমরা গর্ব করতে পারি'। 'প্রাচীন ভারতের ভাববাদী দর্শনচিন্তা ছিল প্রচলিত শোষণব্যবস্থার পরিপূরক'—এই সিদ্ধান্ত বিশদ বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "চতুরঙ্গ" পত্রিকার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায়।[২৭] কিন্তু আজও আমরা বিশ্বাস করে থাকি যে প্রাচীন ভারতে ত্যাগে-তিতিক্ষায়, দানে-ধ্যানে নিস্তরঙ্গ নিরুপদ্রব জীবন গড়িয়ে চলত। তুর্কিরা এসে সব বরবাদ করে দিল। প্রাচীন ভারতে যাঁরা রামরাজ্য অনুসন্ধান করতেন তাঁরাই জাগতিক কর্তব্যগুলো অবহেলা করে আধ্যাত্মিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যদের তুলনায় চিন্তনে মননে শ্রেষ্ঠ—একথা প্রচার করতে গিয়ে নানান মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

অশোককে "জাতীয় সম্রাট" বলা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। পুরাণে তাঁকে শুধু একজন মৌর্য রাজা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিলালিপি আর বৌদ্ধ উপাদান থেকেই আমরা তাঁকে জেনেছি। ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে তাঁর এই অনুপস্থিতি বহু প্রশ্নের উদ্রেক করে। উপরন্তু তাঁর অহিংসানীতির জন্য তাঁকে যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়, আবার মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এই দুর্বল সমরনীতিকে দায়ী করা হয়। চিন্তার এই স্ববিরোধ বিস্মিত করে।

গুপ্ত যুগকে "হিন্দু নবজাগরণের কাল" হিসেবে চিত্রিত করা হয়। "সুবর্ণযুগ" এই বিশ্বাস হৃদয়ে-হৃদয়ে মর্মরিত। কিন্তু একালের শৈল্পিক বিকাশ ঘটেছিল বৌদ্ধ চিত্রকলায় আর ভাস্কর্যে। বৌদ্ধ মঠগুলোর অনুপ্রেরণায় এগুলো বিকশিত হয়েছিল। উপরন্তু বৌদ্ধদের তৎপরতায় চিকিৎসাবিদ্যা, কারুশিল্প প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যযুগে অবহেলিত বিদ্যার নতুন

করে চর্চা শুরু হয়। 'অহিংসা'-নীতিও গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল না। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধনীতি সে দাবি করতে পারে না। 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কৃতিত্ব ছিল অংশত দেশজ এবং অংশত বিশ্বজনীন।'[২৮] ফলত কী কারণে "সুবর্ণযুগ"-অভিধায় ভূষিত করা হল সে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা এটি ছিল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস গোটা জাতির বৃহদংশের মধ্যে প্রোথিত করা হল। বৌদ্ধধর্মের বিনাশের মধ্যে দিয়েই যে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, এবং পরধর্মসহিষ্ণুতা ধর্ষিত হয়েছিল—সে কথাটি পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ করা হয় না। বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ না থাকলে অশোককে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি প্রচার করতে হত না। বর্ণাশ্রমধর্মের নীতি অনুযায়ী সমাজজীবন পরিচালিত হলে প্রাচীন ভারতে এত ক্ষত্রিয় নৃপতির আবির্ভাব সম্ভব হত না।

প্রাচীন ভারতকে "রামরাজ্য" হিসেবে কল্পনা করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সেই যুগের সামাজিক দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেছেন, বিরোধগুলোকে এড়িয়ে গেছেন সচেতনভাবে। কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাস লিখতে বসে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাচীন যুগে কি হত্যার রাজনীতি ছিল না? সে যুগেও সিংহাসন-দখল, রাজহত্যা এবং যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিরোধের নিদর্শন আছে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ভারতের মধ্যযুগের কোনো 'মনোপলি' ব্যাপার নয়। রাজনীতি বড়ো জটিল বিষয়, সেটি স্মরণে রাখা দরকার।

সুলতান মামুদ পৌত্তলিকতাবিরোধী ছিলেন বলেই মন্দির ধ্বংস করেন নি। মামুদের উদ্দেশ্য ছিল বহুমূল্যবান মণিমুক্তা সংগ্রহ আর ধনসম্পদ লুঠ। তৎকালীন শ্রেষ্ঠীদের রত্নভাণ্ডার ছিল এই দেবোপাসনার মন্দিরগুলো। তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই মন্দির ধ্বংস করেন নি। উপরন্তু হিন্দুনৃপতি-কর্তৃক মন্দির ধ্বংসের নজিরও রয়েছে। রমিলা থাপার লিখেছেন, 'একাদশ শতকে কাশ্মীরে হর্ষ নামক একজন রাজার কথা জানা যায়, যিনি অত্যন্ত সংগঠিতভাবে মন্দির ধ্বংসের কাজে লেগেছিলেন।' কলহনের রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে হর্ষ "দেবোৎপাটন নায়ক" নামক একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের দায়িত্ব ছিল হিন্দুমন্দির ও দেবমূর্তি লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করা। সুলতান মামুদের মন্দিরলুণ্ঠন যদি ইসলামধর্মীর হিন্দুবিদ্বেষ হয়, তাহলে হর্ষের (কাশ্মীরের হিন্দুনৃপতি) মন্দিরলুণ্ঠনকে কী বলব? আসলে তাঁর মন্দির-লুঠের উদ্দেশ্য ছিল অর্থসংগ্রহ। উভয় ক্ষেত্রেই রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্ম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৪-এ ঐতিহাসিক জি. সি. পাণ্ডে সোমনাথমন্দির নির্মাণের (অংশত) জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহুলপঠিত 'টেক্সট বুক'-গুলোতে সনাতন ভারতের পরধর্মসহিষ্ণুতা সম্পর্কে যে উপকথাভিত্তিক ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে তাও সঠিক নয়। পারমার হিন্দু শাসক সুভাতবর্মণ (১১৯৩-১২১০) গুজরাট আক্রমণ করে দাভয় ও ক্যাম্বে অঞ্চলে বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।[২৯] সনাতন ভারতের লিঙ্গায়েৎ আর শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ লোকেরা বৌদ্ধ মঠ ও জৈন মন্দির এবং পুঁথিগুলো ধ্বংস করেছেন নির্মমভাবে। শৈব শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিরোধী হিসেবে একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা অবশ্য তা স্বীকার করতে চান না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে মিথ্যা ইতিহাস এবং রাজনীতিমূলক উপকথা রচনা করেছেন। এর ফলেই ভারতীয় ইতিহাসের ওপর ইসলামীয় প্রভাবের সঠিক চরিত্রটি আমরা অনুধাবন করতে পারি নি। সম্প্রতিপ্রকাশিত একটি রচনায় গৌতম রায় ভারি চমৎকার লিখেছেন, 'প্রাচীন যুগের এমন স্বর্ণময় ছবি তুলে ধরার জন্য

যেসব উপাদান ব্যবহার করা হল, সেগুলো কোনওটাই সমসাময়িক জীবনের বাস্তব আলেখ্য নয়, বরং জীবন-যাপনের আদর্শ কী হওয়া উচিত, রক্ষণশীল সমাজ-পতিদের কলমে তারই প্রস্তাবনা। আচরণের তাত্ত্বিক সূত্র এবং বক্ষ্যমান সমাজজীবন কোনও যুগেই অভিন্ন হতে পারে না, "হিন্দু যুগেও" ছিল না।'

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও অন্ত্য-তদন্তকালে আমাদের এই কথাও মনে রাখতে হবে, 'যে কোন সমাজব্যবস্থাই হিন্দু সমাজে আদৃত যদি সেই ব্যবস্থা সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ শাসন মেনে নেয়।'[৩০] প্রাচীন হিন্দু ভারতের এই আদর্শকে আধুনিক ভারতের বহু ঐতিহাসিক আজকের সমাজ-তাত্ত্বিক আদল বা 'সোসিওলজিকাল মডেল' হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। এ কথা আমরা আজ অনেকেই স্মরণে রাখি না, '……হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক শক্তি আজ সীমিত, নিঃশেষিত বললেও ভুল হয় না।… …ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ একদিন যে সমাধান দিয়ে-ছিলেন, সেই সমাধান আজ অবান্তর।'[৩১]

প্রকৃত ইতিহাসচর্চার উপজীব্য

ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায় এবং বিশ্লেষণে সাম্প্র-দায়িকতার প্রভাব মধ্যযুগের ইতিহাসকে বিশেষভাবে বিকৃত করেছে। ভারতের মধ্যযুগ-বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ. এম. ইলিয়ট তাঁর "The History of India as Told by its Own Historians" (1849) নামক গ্রন্থের 'Original Preface'-এ মধ্যযুগীয় ইসলামধর্মী শাসকদের হিন্দুদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা বিবৃত করে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের (তাঁর কথায় 'the bombastic Babus') ব্রিটিশ শাসনের 'mild-ness and equity' স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের অবস্থা মনে রেখে তাঁদের যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা বন্ধ করা উচিত, সে কথাটি বলতেও তিনি ভোলেন নি। এদেশের ঐতিহাসিকরা 'বেদবাক্য' হিসেবে তা বিশ্বাস করেছেন।

'হিন্দু দেবস্থানের পবিত্রতা বিনষ্ট করার ঘটনা এবং তুর্কী আফগান ও মুঘলযুগের ইতিবৃত্তে হিন্দু বিদ্বেষের কাহিনী মধ্যযুগের একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে অনেকে দাবি করেন। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখেছেন, "মুসলমান শাসনের ইতিহাস হচ্ছে হিন্দুদের দমন করে রাখবার ইতিহাস" ।'[৩২]

মধ্যযুগকে বলা হয়েছে "মুসলমান সভ্যতা" বা "মুসলমান আমল"। শাসকগোষ্ঠী ইসলামধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পূর্ববর্তী নৃপতিরা ছিলেন পর্ববিভাগ-কর্তা এবং সমর্থক শ্রেণীর বিশ্বাসানুসারে "হিন্দু"। এই ধর্মগত কারণেই হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ বলা হয়েছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর ইতিহাসই দেশের সার্বিক ইতিহাস নয়। রাজার ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসরচনার মূল পটভূমি নয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে ইতিহাসের মূল নির্ণায়ক শক্তি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কালের উৎপাদনভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এর ওপর নির্ভর ক'রে সমাজের ক্রমবিকাশ এবং গড়নের পরিবর্তন হল প্রকৃত ইতিহাসচর্চার উপজীব্য। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হরবংশ মুখিয়া এইভাবেই প্রকৃত ইতিহাসের মূল্যায়ন করেছেন।

প্রাচীন ভারত যেমন "হিন্দু যুগ" নয়, তেমনি মধ্যযুগের ভারত "মুসলিম যুগ" নয়। উপরন্তু মুসলমান বলে সার্বিক অর্থে যে কথাটি ব্যবহার করা হয় তাও সঠিক নয়। কেননা তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'তুর্ক' বা 'তুরকি' 'আরব', 'পাঠান', 'মোগল' ইত্যাদি হিসেবে। এঁদের সকলকেই 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ' হিসেবে এদেশের লোকেরা জানতেন। বহিরাগত হিসেবে কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কালে তা ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একসঙ্গেই গোটা ভারতে মুসলিম শাসন স্থাপিত হয় নি। আরবরা সিন্ধু জয় করেন ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। একাদশ শতকে পানজাবের কিয়দংশ

তুর্কিরা দখল করেন। ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারত জয় করেছিলেন তাঁরা। চতুর্দশ শতকে দাক্ষিণাত্য 'মুসলমানদের' অধিকারে আসে। প্রত্যন্ত দক্ষিণে মুসলমান রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আরও পরে। এই কালসীমায় যে-সমস্ত হিন্দু রাজবংশ ছিল তাদের কি আমরা এই যুগ থেকে বাদ দেব? ফলত লক্ষ করা যাচ্ছে যে, "হিন্দুস্তানে" মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই। উত্তর ভারতের বিশাল অংশ যে মুসলমানরা দখল করেছিলেন তাঁদের আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে সেটি সত্য। কিন্তু শুধু উত্তর ভারতই সমগ্র ভারত নয়। এই ভুলটি প্রাচীন যুগের ব্যাখ্যাতেও এদেশীয় ঐতিহাসিকরা করেছিলেন। তাঁরা প্রাচীন ভারতের "মধ্যদেশ" বা "আর্যাবর্ত"-কে পুরো ভারতের মাপকাঠিতে বিচার করেছিলেন। আজও দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা আর্যাবর্তের প্রাধান্যকে স্বীকার করতে চান না।

মধ্যযুগীয় মুসলিম রাজবংশগুলোর শাসনকে এদেশীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকরা "বিদেশী শাসন" বলতে দারুণভাবে আগ্রহী। অগণিত জাতিসত্তা এদেশে প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে একমাত্র ব্রিটিশ শাসকদেরই বিদেশী বলতে পারি। স্মর্তব্য : আর্য, পাঠান, তুর্কী, মোগলরা ভারতকেই দেশ করে নিয়েছিল। উজবেকিস্তানের বাবর কিভাবে এদেশকে আপন করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন 'তুজুক-ই-বাবরি'-তে। তুর্ক-আফগান ও মোগলদের "হোম" ছিল ভারতবর্ষ। ব্রিটিশরা তা ভাবে নি। সলিম চিস্তি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি এদেশীয় সাংস্কৃতিক বিকাশের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। আমির খসরু "নু-সিপির" গ্রন্থে এদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এক হাতে কোরান অন্য হাতে তরবারি—এই নিয়ে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ও সাম্রাজ্য-স্থাপন—সর্বাপেক্ষা প্রচারিত মতবাদ এটি। অথচ বহুসংখ্যক হিন্দুকে হত্যা বা ধর্মান্তর ঘটিয়ে ভারতে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। উপরন্তু এই আক্রমণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনো গণপ্রতিরোধও উত্থিত হয় নি। অনেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। উন্নত রণকৌশল ও সংগঠনশক্তি নিয়ে তুর্কীরা এদেশ জয় করেন। এই-দেশীয় রাজা, রানা ও জমিদারদের পদচ্যুত করেন নি তাঁরা। নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে তাঁদের স্বীকার করে নেন। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপর তুর্কীরা হস্তক্ষেপ করেন নি। কেননা নিরন্তর যুদ্ধ তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ড. মুখিয়া লিখেছেন, 'শাসনব্যবস্থার নিম্নস্তরে হিন্দুরাই সর্বেসর্বা রয়ে গেলেন। এইভাবে তাঁরাই ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য পত্তনে সাহায্য করলেন এবং শাসনব্যবস্থার ভারও তাঁদের হাতে রইল। তাঁদের সাহায্য না পেলে তুর্কীদের বেশিদিনের জন্যে ভারতে-অবস্থান সম্ভব হত না।'[৩৩]

তুর্কী আক্রমণের সময় কোনোরকম গণপ্রতিরোধ দেখা যায় নি কেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধেও গণপ্রতিরোধ হয় নি), সেই আশ্চর্যজনক বিষয়টি আলোচিত হওয়া দরকার। তুর্কী আক্রমণকালে এদেশের 'সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ-নৈতিক শ্রেণী' ছিল পুরোহিতকুল। তৎকালীন নৃপতি এবং এই পুরোহিতকুল সাধারণ মানুষকে শোষণ করত। হিন্দুস্থান 'ইতালি ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মতো বিলাস ও দুঃখের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ' যেখানে ইন্দ্রিয়চেতনা ও আত্মপীড়নের ধর্ম প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী।'[৩৪] তুর্কী আক্রমণের সময় পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা লালসাময় জীবন-যাপনে ব্যস্ত ছিলেন। শত্রু দোরগোড়ায় হাজির অথচ সজাগ হন নি। চাঁদ বরদাই "পৃথ্বীরাজ রাসো কাব্যে" নৃপতির নৈতিক অধঃপতনের বর্ণনা দেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তা সমর্থন করেন। 'দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের হিন্দু রাজারা ছিলেন কূপমণ্ডুক, জাতিবিচারের জন্য মানুষ ছিল বিভক্ত', ফলত প্রজা-সাধারণ তুর্কী আক্রমণ রোধে কোনো উৎসাহ বোধ করেন নি। হরবংশ মুখিয়া গণপ্রতিরোধ না হওয়ার

কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, "মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি" নামক একটি দিকনির্দেশক প্রবন্ধে। সেই ধারা মোতাবেক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি আলোচনায় গৌতম রায় লিখেছেন, '…সে সময় হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয় এমন স্তরে পৌঁচেছিল যে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজপুত প্রভুদের হয়ে লড়ার কোনও প্রেরণা জনগণের মধ্যে জাগে নি। জাগার কথাও নয়। তুর্কীদের চেহারা, লোকাচার, সংস্কৃতি বা শাসন-পদ্ধতির মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর বা দানবীয় কিছু ছিল না, যা হিন্দুস্তানের জনগণ ইতিপূর্বেই রাজপুতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন নি। শুধু বহিরাগত বিধর্মী বলেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে, এমন কোনও কুসংস্কার ত্রয়োদশ শতকে ছিল না। থাকলে রাজপুত-দেরই কি এখানকার ভূমিপুত্ররা মেনে নিতেন? কিংবা তারও আগে বর্বর আর্য উপজাতীয়দের? তুর্কীদের চেয়ে তারা তো কম বহিরাগত ছিল না, কিংবা কম বিধর্মী। কয়েক শতাব্দী আগে তারাও তো তুর্কী-দের ভূখণ্ড থেকেই এদেশে ঢুকেছিল? আসলে বইয়ে যাই লেখা হোক, তদানীন্তন জনসাধারণ তুর্কী আধিপত্যকে বিদেশী আগ্রাসন ভেবে নেয় নি। গণ-প্রতিরোধও তাই দেখা দেয় নি।'

আলবেরুনীর বিবরণ থেকে জানা যায় সুলতান মামুদের হিন্দুস্তান অভিযানকালেও ধর্মের অজুহাতে প্রজাসাধারণকে দাবিয়ে রাখত আর পুরোহিতশ্রেণী শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতা করত। দারিদ্র্য, জাতপাত এবং ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্যশ্রেণীর যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার ফলে সুলতান মামুদের পক্ষে যুদ্ধাভিযান অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। সুলতান মামুদ এদেশের মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন ঠিকই (কারণ আগেই বলা হয়েছে) কিন্তু তাঁর একান্ত সচিব আল-উতবীর একটি বিবরণ থেকে স্বধর্মাবলম্বী প্রজাসাধারণের দুর্দশার চিত্রও ধরা পড়ে। সেটি অবশ্য স্বদেশের দুর্ভিক্ষকালীন একটি ঘটনা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রনীতিতে ইসলাম শাসনে ভারতে ধর্মের নামে অনেক অত্যাচার হয়েছে। ভারতে ধর্মবিরোধের মূলে ইসলামের গোঁড়ামিই দায়ী। গত প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে এই ধরনের প্রচারণামূলক ইতিবৃত্ত পঠিত হয়ে আসছে এদেশে। কিন্তু হরবংশ লিখেছেন, 'রাষ্ট্র যে কখনো ব্যাপকভাবে সব হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, বা প্রচণ্ড উৎসাহে ইসলামি আদর্শ প্রচার করেছিলেন, এরকম কোনো প্রমাণ নেই।'[৩৫] মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোনো-কোনো অভিজাত পরিবারকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা অবশ্য হয়েছিল—সেটি স্বীকার করতে হয়। অন্য একটি বিষয়ও আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আজও ধর্মের নামে আকসার রক্তপাত, বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, অগণন মানুষ নিহত হন। মধ্যযুগে কিন্তু ব্যাপক এলাকা জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা, বিরোধ ও প্রতিবেশীর উপর হামলা করে দেশছাড়া করার নজির নেই।[৩৬] এই প্রসঙ্গে হরবংশ মুখিয়ার একটি অত্যন্ত মূল্যবান উক্তির উদ্ধৃতি অপরিহার্য: 'সপ্তদশ শতকে যখন মারাঠা, শিখ ও জাঠ অভ্যুত্থান দেখা দিল এবং মোগল রাষ্ট্রের সঙ্গে মারাঠী ও শিখদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল, তখনো কিন্তু সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। এমন কি ঔরঙ্গজেবের সর্বাধিক 'স্বৈরাচারের' পর্বেও হয় নি। অথচ যদিও আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সরকারিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, তবুও আমাদের জীবনকালেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এত ঘন-ঘন হয়েছে যে আমরা কেউ-কেউ সেগুলির অমানুষিকতা এবং অন্ধ গোঁড়ামি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছি।'[৩৭]

একজন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন যে "মুসলমান আমলে" ব্যাপক মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল বলেই বাঙলায় হিন্দু মন্দির বিরল। ১৯৭০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ডেভিড জে ম্যাকাচনের অজস্র সচিত্র উদাহরণসহ গবেষণামূলক আলোচনায় এই ভিত্তিহীন সাম্প্রদায়িক দাবি অপ্রমাণিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামরিক কারণে বহু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ, স্থলতান, বিদেশী আক্রমণকারী, বাদশাহর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল—এটি যেমন সত্য, তেমনি পুরো মধ্যযুগে ধর্মপালনে কোনো বাধা ছিল না—তার নজিরও রয়েছে ভূরি ভূরি। সাম্প্রদায়িক-তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই বাবদে চিন্তা করেন না।

আলাউদ্দিন খলজি বিদ্রোহী হিন্দু জমিদারদের দমন করেছিলেন বলেই "ধর্মোন্মত্ত" ছিলেন—এমন সিদ্ধান্ত পাঠ্যবইয়ে লেখা থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি যে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমানকেও কঠোর ভাবে দমন করেছিলেন—সেটি কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আসলে এটি রাজনীতির সওয়াল। আলাউদ্দিন খলজি প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন, সেটিও বিবেচনা করে দেখা জরুরি। পদ্মিনী-প্রসঙ্গই শেষ কথা নয়।

মোহাম্মদ-বিন-তুঘলকের কার্যপদ্ধতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকতেই পারে। তাঁর চরিত্রে কতকগুলো পরস্পরবিরোধী প্রবণতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল, সেটিও তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু তাঁকে একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষা-তাত্ত্বিক, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ, বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রতিভার বিচারে মধ্যযুগে ভারতীয় নৃপতি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেও নেব, আবার শেষ সিদ্ধান্তে বলব 'পাগলা রাজা'—এসব নিছক পাগলামি বিচার। আসলে সময়ের থেকে অনেক অগ্রবর্তী ভাবনা তিনি করেছিলেন। এসবে বিচক্ষণতার অভাব এবং অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় ছিল। তিনি অসট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের মতো আদর্শবাদী। হিন্দু প্রজাদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। রতন নামে জনৈক হিন্দু কর্মচারীকে রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে তিনি নিয়োগ করেন। 'সতীদাহ'প্রথা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন সর্বপ্রথম। নানা কারণে তিনি বহু কাজে সফল হতে পারেন নি। সেটিও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু 'পাগলা রাজা'র প্রসঙ্গটি মেলাব কী করে? অথচ এটি স্কুলের পরীক্ষায় নিয়মিত প্রশ্ন।

মোহাম্মদ ঘোরি, ফিরুজ তুঘলক বা আওরঙ্গজেব যে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সাধারণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করে নি। এই গোঁড়ামি সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার পরিচয় আমরা পেয়েছি সুফিবাদ, বৈষ্ণব ও ভক্তি আন্দোলনে এবং সাহিত্যে। সর্বাত্মক অবক্ষয়ের যুগ হিসেবে মধ্যযুগকে অভিহিত করলেও এই যুগেই জন্ম নিয়েছিল শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং একেশ্বরবাদী ইসলামের প্রভাবে উদয় হয়েছিল ব্রহ্মবাদী শংকরের। ক্ষয়িষ্ণু "হিন্দুধর্ম" প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল এই যুগেই।

তুর্ক-আফগান ও মোগল আমলে বহু হিন্দু অভিজাত রাষ্ট্রের সেবা করেছেন। তিলক, ব্রহ্মজিৎ গৌড়, হিমু, কেশবভট্ট, মানসিংহ, রাজা জয়সিংহ গুরুত্বপূর্ণ সামরিকপদাধিকারী ছিলেন। জমিদার শ্রেণী ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। পুরো মধ্যযুগে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদকুলি খাঁ তো জমিদারি হিন্দুদের হাতেই সমর্পণ করেন। অবশ্য শাসকগোষ্ঠী এবং সমর্থক শ্রেণী রাজকীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ধর্মের নামে ধর্মান্ধতার আশ্রয়ও গ্রহণ করতেন। তবে এটিও মান্য করতে হবে যে মধ্যযুগে ধর্মের ওপরে রাজনীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। সে অর্থে শাসনপদ্ধতি ধর্মাশ্রয়ী ছিল না। হিন্দু মুসলিম উভয় অভিজাত বা ওমরাহ সুলতান বা বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। এটি ছিল রাজার ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগদখলের ব্যাপার। ধর্মের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। উলেমা শ্রেণী সুলতানের পছন্দমত আইনের ব্যাখ্যা করতেন।

মন্দির ধ্বংস করার প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা হিন্দুদের গণধর্মান্তরের ধারণাটি সোৎসাহে বর্ণনা করেন। মন্দির ধ্বংস করার অন্য যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, হিন্দুদের ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা নিশ্চয়ই নয়; কেননা ঘৃণার মাধ্যমে কারোর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। শত্রু-এলাকার মন্দির যেগুলো প্রার্থনার পরিবর্তে রাষ্ট্র-

দ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, সেই মন্দিরগুলোর বিনাশের মধ্যে সুলতান বা বাদশাহরা গর্বানুভব করতেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, হিন্দু নৃপতিরাও মন্দিরধ্বংসের নজির স্থাপন করেছিলেন। কাশ্মীরের হিন্দুরাজা হর্ষ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য তাঁর রাজ্যেরই চারটি বাদে সব মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। রমিলা থাপার এবং হরবংশ মুখিয়া সে প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। সুভাতবর্মনের বিষয়টিও পূর্বেই আলোচনা করেছি। মধ্যযুগে ব্যাপক ধর্মান্তরীকরণ হয়েছে, কিন্তু সেটি করেছেন অস্পৃয়াশূন্য জীবনের অধিকারী সুফি-সন্ত ও দরবেশরা। 'দলিত-শ্রেণী' মানুষেরা মর্যাদালাভের জন্য সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হরবংশ মুখিয়া লিখেছেন, 'এই মূল ধারণা থেকে মুসলমান সৌভ্রাত্রের ("মিল্লাৎ") ধারণাটি গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া ইসলামধর্মে কোথাও সংকীর্ণ শাসকগোষ্ঠী, এমন কি সংকীর্ণ কোনো পুরোহিতগোষ্ঠীরও স্থান ছিল না।'[৩৮] ধর্মান্তরীকরণ জাতীয় নীতি ছিল না বলেই 'অতিরিক্ত বিশুদ্ধতাবাদী' আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রেও এই অভিযোগটি টেকে না। (অথচ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রজাদের ধর্মান্তরিত করার জন্যে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছিলেন। এতে উদারতার কোনো পরিচয় পাওয়া গেল কি? তাঁকে আমরা 'মহামতি' হিসেবে বন্দনা করি এবং আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছ থেকেই "অহিংসা"-নামক আইডিয়াটি গ্রহণ করেছে।) তাই বলে মধ্যযুগীয় ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল, তেমন কথাও বলা হচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষ এই ধারণাটি আধুনিক যুগের চিন্তাভাবনার ফসল। ধর্মপ্রচারের জন্য, কোনো ইসলামধর্মী শাসক ও অশোকের মূল্যায়ন একই মাপকাঠিতে হওয়া উচিত। আসলে ইসলামের ব্যাপক বিকাশ অনেকের কাছেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। ড. মুখিয়া মন্তব্য করেছেন, 'এই ধরনের মনোভাবকে দমন করার জন্যে আমাদের সচেতনভাবে চেষ্টা করা উচিত।' সেকুলার আইডিয়ার সঙ্গে অপরিচিত হলেও সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক কারণে আকবরকে জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রশংসা করা হয়। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকও আকবরের উদারতার ভূয়সী প্রশস্তি করেন, কেননা আওরঙ্গজেব ও অন্যান্য সুলতান-বাদশাহদের ধর্মান্ধ হিসেবে বর্ণনা করার সুবিধে হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতই রাষ্ট্রের নীতিনির্ণায়ক শক্তি। শাসকের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নয়।

জিজিয়া সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষ জটিল। অনেক ঐতিহাসিক অভিযোগ করে থাকেন যে হিন্দুদের মুসলমান করার উদ্দেশ্যে এই করটি প্রচলিত হয়েছিল। জিজিয়া সামরিক কর। যুদ্ধে যোগদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরই জিজিয়া দিতে হত। মুসলিমদের যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। উপরন্তু "জাকাত" "খারাজ" "খামস"-নামক কর মুসলমানদের দিতে হত। "জাকাত" বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর। ভারতবর্ষ-এর বাইরে মুসলমান শাসকরা মুসলমান প্রজাদের ওপর "জিজিয়া" কর বসাতেন। ইবন বতুতা 'রিহালা' ('সফরনামা')-তে লিখেছেন চতুর্দশ শতকে দাক্ষিণাত্যে 'হিন্দু' জামোরিনবংশীয় রাজারা তাঁদের ইহুদি প্রজাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন। "জিজিয়া" আদায়ের ক্ষেত্রও ছিল সীমিত। সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হিন্দু কর্মচারীদের জিজিয়া দিতে হত না। নারী, শিশু, পঙ্গু ও ব্রাহ্মণদের এই কর দিতে হত না। হরবংশ মুখিয়া সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, 'তর্কের খাতিরে যদিই বা ধরে নেওয়া হয় যে জিজিয়া করের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণই ধর্মীয়, তাহলেও একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে এমনই উদাসীন ছিলেন যে সামান্য একটা কর এড়াবার জন্যে ধর্মত্যাগ করতে পারতেন (বিশেষত পুরোপুরি এড়াবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মুসলমান হলেও তাঁদের "জাকত" কর দিতে হত)।' জিজিয়া আদায়ের প্রশ্ন নিয়ে হিন্দু-

মুসলমান বিরোধের প্রশ্নের জবাবে সতীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ১৫২৬ সালে বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন থেকে শুরু করে ১৭৩৯ সালে নাদির শাহর আক্রমণ পর্যন্ত ১৯৭ বৎসরের ইতিহাসে ৫৭ বৎসর জিজিয়া আদায় করা হয়। 'জিজিয়া' সাম্রাজ্যের মধ্যে হিন্দুমুসলমান অনৈক্য সৃষ্টি করে নি। অষ্টাদশ শতকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য, ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি।[৩৯]

আধুনিক যুগের সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা মধ্য-যুগের দরবারি ঐতিহাসিকদের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সে যুগের ঐতিহাসিকরা হিন্দুদের বিনাশ কামনা করতেন। আধুনিক ঐতি-হাসিকদের মধ্যে অনেকেই সেই কথাটি গুরুৎসহকারে প্রচার করে থাকেন। বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন না। তুর্কিরা তদানীন্তন রাজনৈতিক বা সামাজিক কাঠামোর ওপর কোনোরকম আঘাত করেন নি, কেবলমাত্র ওপরদিকে সামান্য, আংশিক পরিবর্তন করেছিলেন। এই স্থিতাবস্থা দরবারি অভিজাত ও অমাত্য শ্রেণীর পছন্দ ছিল না। হিন্দু রাজা, রাও, রানা, জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী রায়, মুকাদ্দম, চৌধুরী—এঁরাও ছিলেন বৃহত্তর শাসকশ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং জিয়াউদ্দিন বরনী অন্যান্য দু-একজন ঐতিহাসিক যখন "হিন্দু" শব্দটি ব্যবহার করতেন, তখন এইসকল উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের কথাই বলতেন, সাধারণ কৃষকদের বিরুদ্ধে নয়। কেননা হিন্দু কৃষকদের খাজনার ওপরেই নির্ভর করত তাঁদের জীবনযাত্রার মান। ফলত এখানে "হিন্দু" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক অর্থে, ধর্মীয় অর্থে নয়। এই বিশ্লেষণটি সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক-দের পছন্দ না হওয়ারই কথা।[৪০]

উলেমাসম্প্রদায় নানাভাবে হিন্দুদের ওপর বিদ্বেষের মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ কাজি মুঘসুদ্দিনের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি আলাউদ্দিনকে 'জিজিয়া' কর সংক্রান্ত একটি পরামর্শ দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু আলাউদ্দিন তা অমান্য করেন। আলাউদ্দিন একটি সাহসী উক্তি করেছিলেন, 'রাষ্ট্রের পক্ষে যা হিতকর তাই আমি করি। তাতে শরিয়তের নিয়ম রক্ষা হয় কিনা আমি জানি না।' কোনো ধর্মান্ধ মুসলমান শরিয়তের এমন ব্যাখ্যা করে কি? উলেমাসম্প্রদায় রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতেন না। আলাউদ্দিনের এই নীতিই ছিল সুলতানি রাষ্ট্রের গৃহীত নীতি। ফিরুজ তুঘলক ব্রাহ্মণদের জিজিয়া করের আওতায় এনেছিলেন, আবার তিনিই ইসলামের নামে শরিয়ত-বিরোধী অজস্র কর অবলুপ্ত করেছিলেন; হিন্দু দেবস্থান ভেঙে দিয়েছিলেন, আবার তিনিই হিন্দু কৃষকের উন্নতির জন্য ব্যগ্র এবং কৃষির উন্নয়ন ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সেচখাল করেন। অথচ গ্রামাঞ্চলের হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত রাজস্ব আদায়কারী ও জায়গীরদাররা কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। এই শ্রেণী স্ব-স্বার্থসিদ্ধি, কৃষকশোষণ ও রাষ্ট্রকে কর ফাঁকি দিতে ব্যস্ত থাকতেন। ধর্মান্ধ নামে পরিচিত ফিরুজ শরিয়তবিরোধী কর তুলে দেবার ফলে অজস্র কৃষক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তৈমুরের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হিন্দু-মুসলমান লড়াই করেছিল সেটি জানা যায় "মালফুজুত-ই-তৈমুরি" নামক গ্রন্থ থেকে। ফিরুজ তুঘলক এবং সিকান্দর লোদীর নীতির ফলে পণ্যমূল্য হ্রাস পেয়েছিল বলে জনগণ অপেক্ষাকৃত সুখে ছিলেন। আবার সিকান্দার লোদী শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে জৌনপুরের মসজিদ ভেঙে দিয়েছিলেন। ধর্মান্ধ সিকান্দার লোদী মসজিদ ধ্বংস করছেন—সেটির বিশ্লেষণ কিভাবে করব? সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা এর কী ব্যাখ্যা দেবেন? সুলতান ফিরুজের হিন্দুবিদ্বেষের ফলে অগণিত প্রজা-সাধারণের কোন ক্ষতি হয় নি। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলো তাঁকে ভয়ানক ধর্মান্ধ হিসেবে বর্ণনা করে। এর তুলনা বোধ হয় একমাত্র আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেবের মতো ঘৃণিত ব্যক্তি ভারত-ইতিহাসে বোধ হয় আর কেউ নেই।

আওরঙ্গজেব 'অতিরিক্ত বিশুদ্ধতাবাদী' ছিলেন

এটি অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তাঁকে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করার মহৎ দায়িত্বটি সম্পাদন করেছেন জাতীয়তাবাদী তথা সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকরা। আওরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করেছেন, জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন করেছেন এবং তিনি ছিলেন অসাধারণ ধর্মপ্রেমী। সুতরাং তাঁর অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নাকি খুবই স্বাভাবিক। উপরন্তু 'জাতীয় বীর' শিবাজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল লড়াই—সব মিলিয়ে ঐতিহাসিকরা তাঁকে "ভিলেন" হিসেবে চিত্রিত করেন। তাঁরা বিচার করেন না যে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমি ছিল কয়েকটি মন্দির, সেগুলো তিনি নিরাপত্তার খাতিরে ধ্বংস করেন। উপরন্তু তাঁরা বলেন নি যে মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি জাগির দিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন। তাঁরই আনুকূল্যে কয়েকটি বড়ো মন্দির ১৬৫৯-১৬৮৫ পর্বে নির্মিত হয়েছিল। জৈন মন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের জন্যও তিনি অর্থ দান করেছিলেন। বি. এন. পাণ্ডে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'Islam and Indian Culture'-নামক একটি পুস্তিকায় (পাটনায় প্রদত্ত খুদাবক্‌স্ স্মারক বক্তৃতা ভিত্তি করে এই পুস্তিকাটি রচিত) সম্রাটের ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একদা এদেশে পরাজিত শত্রুর কাছ থেকেও "জিজিয়া" আদায় করা হত। আওরঙ্গজেব সেটি করেন নি। এ ছাড়া নাবালক, বৃদ্ধ, বেকার, অশক্ত ও দরিদ্র পুরুষ এবং মহিলার কাছ থেকে জিজিয়া আদায় নিষেধ করেন তিনি। ব্রাহ্মণদের ওপরও তখন জিজিয়া ছিল না। শুধুমাত্র সমর্থ হিন্দু যুবক যাঁরা যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না তাঁদের 'জিজিয়া' প্রদান করতে হত। বাস্তব এই যে, তাঁর আমলেই 'জিজিয়া' আদায়ের প্রকৃতি ছিল নমনীয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে আওরঙ্গজেব ৬৬টি কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন যেগুলো আকবরের আমলেও আদায় করা হত। 'Fatuhat-I-Alamgiri'-নামক গ্রন্থে ঈশ্বর দাস এই বিষয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন।[৪১] জিজিয়া সংক্রান্ত নানা তথ্য এবং বিশেষত মঠ-মন্দির নির্মাণ বিষয়ক তথ্য কালীকিংকর দত্ত উদ্ধার করেছেন। এইসব তথ্য ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয় না।

মোগলদের শাসনকালে রাজপুতরা, টোডরমল, বীরবল এবং আরও অনেকে বিশেষ দায়িত্বশীল পদ অধিকার করেন। আতাহার আলির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে ১৬৫৮-৭৮ সালের মধ্যে মোট অভিজাতবর্গের মধ্যে অমুসলিম অভিজাতরা ছিল ২১'৬% সেখানে আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষ দশকে তাঁদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩১'৬%-এ। আতাহার আলি আরও লিখেছেন যে, আওরঙ্গজেব মারাঠা ও রাজপুতদের মনসবদারি দান করেন।[৪২]

এযাবৎ কাল মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতিকে দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু হাল আমলের বিজ্ঞানভিত্তিক নিরপেক্ষ গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর ধর্মনীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ নয়। জাঠ, সৎনামী বিদ্রোহ মূলত কৃষকবিদ্রোহ। আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত কর আদায়ের ফলেই এই বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ঘটে। মারাঠাদের সংঘর্ষের প্রকৃতি ছিল অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক। উপরোক্ত মতটি পোষণ করেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র, পনজাব, আগ্রা এবং মথুরা অঞ্চলের কৃষকরা অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মনসব নিয়ে প্রতিযোগিতা অশেত সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল। মোগল যুগে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা, সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য, অভিজাতদের কলহ, দ্বন্দ্ব, দল ও রাজনীতি নিয়ে যুক্তিবাদী ও সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন ইরফান হাবিব, গৌতম ভদ্র, আতাহার আলি এবং সতীশচন্দ্র।[৪৩] মোগল রাজন্যবর্গ যখন জায়গীর নিয়ে কলহে মত্ত, কৃষকবিদ্রোহ দেশের প্রান্তে প্রান্তে, সেই সময় বৈদেশিক আক্রমণে এই বিশাল

সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অথচ এযাবৎকাল ইতিহাস-শিক্ষকরা কালিকারঞ্জন কানুনগো, পারসিভাল স্পিয়ার, ভিনসেনট স্মিথ এবং যদুনাথ সরকারের মূল্যায়নকে শেষ কথা বলে বিশ্বাস করলেন, এবং ছাত্রদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিলেন।

হিন্দু নৃপতির সঙ্গে মুসলমান শাসকদের লড়াইকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বৌক বিদ্যমান। কিন্তু এগুলো ছিল রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংঘর্ষ। এই যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃতি সাম্প্রদায়িক হলে আওরঙ্গজেব সমরবিভাগে এমন বিপুলসংখ্যক হিন্দু-ধর্মাবলম্বীকে নিয়োগ করতেন না। শিবাজীও সৈন্যবিভাগে মুসলমান-প্রবেশ নিষিদ্ধ করতেন। আওরঙ্গজেবকে "ভারতসম্রাট" হিসেবে না ধরে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি ভাবা হচ্ছে এবং শিবাজীকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের নায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং একটি সনাতনী সন্তোষ বোধ করছেন সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা। শিক্ষকরাও নাটকীয় কায়দায় এই ইতিহাস পড়িয়ে ছাত্রদের মনকে বিষিয়ে দিচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতারা ফয়দা লুটবেন এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে। এই মতটা হল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এস. হাজিম কিদোয়াই-এর। আমরা এই সত্যটি মনে রাখি না যে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনামলে স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও খুব কম সংঘর্ষ হয় নি। নিজামউল মুলক প্রয়োজনে মারাঠাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এই বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন আধুনিক ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র এবং আতাহার আলি।[৪৪]

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে জীবনের বহুক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে, সে কথা কস্মিনকালেও উচ্চারিত হয় না। কিন্তু বাস্তব এই যে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সমাজের উচ্চবর্গের লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং 'স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ব্রাহ্মণ, উলেমা ও দরবারের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা সত্ত্বেও মিলনের স্রোত ধীরে ধীরে গতিশীল হয়ে উঠেছিল।' ভারতীয় সভ্যতা "হিন্দু সভ্যতা" বা "মুসলমান সভ্যতা" নয়—এ এক মিশ্র সভ্যতা, "কমপোজিট কালচারে"র দেশ। বৈদিকরা যেমন বিদেশী নন, তেমনি বিদেশী নন মুসলমানরাও। সবাই ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষকে "স্বদেশ" বা "ওয়াতন" হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার সমন্বয়বাদী বিশ্লেষণ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, জগদীশনারায়ণ সরকার এবং হাল আমলে পূর্ব বাঙলার বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত।[৪৫] কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার যেমন এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকার করেন না, তেমনি স্বীকার করেন না পাকিস্তানি ঐতিহাসিক ইশতিয়াক আহমেদ কুরেশী।[৪৬] রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন যে, মধ্যযুগীয় মুসলমান আক্রমণ তাঁদের শুধু শাসনচ্যুত করে নি, সামাজিক ও ধর্মীয় নীতির ওপরও আঘাত হেনেছিল। কিন্তু আমরা কি একথা স্মরণে রাখি যে মৌর্য শাসনের অবসানের পরই শুঙ্গ রাজবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া নতুন করে জেগে ওঠে, এবং এই সময় রচিত মনুসংহিতায় নিম্নবর্ণ, দাস ও নারীদের প্রতি চূড়ান্ত কঠোরতা, ধর্মীয় উৎকট বীভৎসতা সমাজের বন্ধ্যা দশারই নিদর্শন!

'মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি'-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হরবংশ মুখিয়া একটি বিশেষ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, তুর্কিদের ঢের আগে রাজপুতরা ভারতে এসে অদ্যাবধি তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা পরিহার করেন নি। চৌহান, পরিহার, শোলাঙ্কি আজও বিশেষ পরিচিতি বহন করে, কিন্তু দাসবংশ (এই পরিচিতিটি তর্কাতীত নয়, কেননা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েই তাঁরা সুলতানপদে আসীন হন), খলজি বংশ, তুঘলক বংশ, লোদি বংশ, এমন-কি এই সেই দিনের মোগলরা 'ভারতীয় জীবনের মূল ধারণাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছেন এবং নিজেদের

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে এই জীবন-প্রবাহকে তাঁরা যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন আর কোনো কিছুতেই তা হয় নি।'[৪৭]

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসকে "মুসলিম সভ্যতা" হিসেবে অভিহিত করে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা এই শাসন সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিলেন: ১. এটি বিদেশী শাসন, ২. মুসলমানদের অনিয়ন্ত্রিত-স্বৈরাচারী ও নিষ্ঠুর শাসন। ফলত এদেশীয় আঞ্চলিক বিদ্রোহী যাঁরা মোগল তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধতা করেছেন তাঁরা "জাতীয় বীর" (ন্যাশনাল হীরো), এবং এই বোধের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠল উপন্যাস, নাটক, যাত্রা নামের এক ধরনের সাহিত্য যেগুলো সাম্প্রদায়িকতা ও 'বিভ্রমসৃষ্টিকারী জাতীয়তাবাদ' উত্থানে প্রখর ভূমিকা পালন করল। এই সাহিত্যকর্মগুলোতে না আছে ইতিহাসচেতনা, না আছে মানবীয় ধ্যানধারণা। দীর্ঘকাল থেকে এই কাহিনীগুলো জাতির ভয়ানক ক্ষতির কারণ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতার বিচার করেন না এমন ঐতিহাসিক-দের শিষ্যমণ্ডলী-দ্বারা লিখিত এই-সমস্ত গ্রন্থই ছাত্ররা মুখস্থ করেন, পরে অধ্যাপনা করেন আর নতুন প্রজন্মকে সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত ইতিহাস শেখানোর পথ তৈরি করেন। ফলত নতুন গবেষণাগুলো ছাত্রদের কোনো-ভাবেই উৎসাহিত করে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে "ব্রিটিশ যুগ" বা "আধুনিক যুগে"র সূত্রপাত হয়েছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চা নানা জটিলতা এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দেশবিভাগ তারই পরিণতি। সে ব্যাপক আলোচনার বিষয়। সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। স্বীকার্য যে প্রধানত ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এদেশের জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই বিকৃত চিন্তাধারা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই শৈশব থেকে লালন করে এসেছি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিপন চন্দ্র এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'সাম্প্রদায়িকতার মূলে বরাবরই থেকেছে, গত একশো বছরের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একটি মিথ্যা চেতনা।'

উনবিংশ শতাব্দীর তর্কপ্ররোচক নবজাগরণের নায়করা এবং পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদী নেতাদের (যাঁরা অধিকাংশই ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুধর্মাবলম্বী) মধ্যে সুকৌশলে মুসলিম-বিদ্বেষ ঢোকানো হল। এটি সম্পাদন করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-পরিচালকরা। এদেশীয় নব্যশিক্ষিত সমাজ বোঝানোর চেষ্টা করলেন ব্রিটিশ শাসন 'বিধাতার আশীর্বাদ' স্বরূপ। ভূদেব, বঙ্কিম, নবীন এবং পরবর্তী কালে যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার সেই তত্ত্বই প্রচার করলেন। "বিভ্রমসৃষ্টিকারী জাতীয়তাবাদ" ইতিহাসচর্চার বিষয় হয়ে উঠল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের বৃহদংশ বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন যে, জাতীয়তাবাদ এক-চেটিয়াভাবেই তাঁদের সম্পত্তি এবং তাঁরাই খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক। এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইতি-হাসের ছাত্রছাত্রীরা "হিন্দু ভারত", "হিন্দু জাতীয়তা-বাদ" সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করতে থাকেন।

'বহু আধুনিক ঐতিহাসিক সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে অতীতে টেনে নিয়ে গেছেন এবং হিন্দু-মুসলমানের যে বিরোধ ১৯শ এবং বিংশ শতকে চলেছে তাই দিয়ে আঠারো শতকের রাজনীতির ব্যাখ্যা করেছেন।'[৪৮] এই বোধ থেকেই তাঁরা মারাঠা সাম্রাজ্য ও রাজ্যসমূহ, রাজপুত ও জাঠদের মিলিয়ে 'হিন্দুরাজ্য' নামে কল্পনা করেছেন এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের 'মুসলমান-শাসনাধীন' অঞ্চলগুলোকে বলা হয়েছে 'মুসলমান রাজ্য'। এমন-কি রণজিৎ সিংহের প্রয়াসের ওপরও এই সমস্ত ঐতিহাসিক "হিন্দুত্ব" আরোপ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের এটিও ভেবে দেখতে হবে যে বিংশ শতাব্দীতে 'ভারত'-নামক আইডিয়াটি প্রথম চর্চিত হতে শুরু করে। মাত্র ১৫০ বছর আগেও এই ধারণাটির অস্তিত্ব ছিল না। তখন এইভাবে পরিচিত

হতেন: মারাঠা, হিন্দুস্তানি, তামিল, ওড়িয়া, বাঙালি ইত্যাদি। একজন ভারতীয় সম্পর্কে কারোর কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। বিশপ হেবার ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরভারত ভ্রমণ করে জানিয়েছিলেন যে, উত্তর প্রদেশের লোকেরা একজন বাঙালিকে একজন ইংরেজের মতোই বিদেশী ভাবত। "হিন্দু পাদ-পাদশাহী" শ্লোগান দিয়েও মারাঠারা শিখ এবং রাজপুত রাজ্যকে বিধ্বস্ত করতে দ্বিধা করে নি। বাঙালি, তামিল, কন্নড়, এবং হিন্দুস্তানি কেউই মারাঠাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায় নি। প্রত্যেক ভাষাভাষী লোক একে অন্যকে বিদেশী ভাবত। মারাঠা ও অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিদের ব্রিটিশ পরাজিত করলে বাঙালিরা আনন্দিত হয়েছে। প্রার্থনা করেছে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ছয় আর সাতের দশকের আগে পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে 'ভারত' বলতে পুরো এই উপমহাদেশের চিত্র ভাসত না। এটি অতীতের সাহিত্য আর তত্ত্বেই বিরাজিত ছিল।[৪৯]

বিশিষ্ট বাঙালি নেতা প্রসন্নকুমার বলতেন, ভগবান যদি তাঁকে স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ শাসন বেছে নেবার আদেশ দেন—তিনি ব্রিটিশ শাসনকে মাথায় তুলবেন। রামমোহন পর্যন্ত মুসলিম স্বৈরাচারের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছেন। মুক্তিদূত মনে হয়েছে। তিলক ১৮৮৫তে লিখেছেন, 'ইংরিজি শিক্ষার্জনের পরেই আমরা স্বদেশ-প্রেমিক হতে শিখেছি' ('Patriotism is not our national quality.')

'হিন্দুত্ব'-কে কেন্দ্র করেই এদেশে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। রাজনারায়ণ বসু হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন, ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালে শুরু করলেন 'হিন্দু-মেলা'—চলেছিল ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। এটি বাৎসরিক মেলা। তিনি 'ন্যাশনাল সোসাইটি', 'ন্যাশনাল পেপার' প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দু জাতীয়তাবাদে'র বিশিষ্ট প্রবক্তা তিনি। 'Thus Nabagopal forestalled Jinnah's theory of two nations by more than half a century".[৫০] নবগোপাল লেখেন, 'The basis of national unity in India is Hindu religion. Hindu nationality embraces all the Hindus of India irrespective of their locality or language. The Hindus are destined to be a religious nation.'[৫১]

উদ্ভট ইতিহাসচেতনার ফলেই জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা প্রাচীন যুগের পুরোনো চেতনা অর্থাৎ ধর্ম-চেতনার প্রতি আবেদন জানালেন। এর ফলে তাঁদের চিন্তা এবং লেখাও সাম্প্রদায়িকতাদোষদুষ্ট হয়ে উঠল। বালগঙ্গাধর তিলক "শিবাজী উৎসব", "গণপতি উৎসব"-এর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদ জাগালেন। শিবাজীকে 'মুসলমানদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 'চ্যাম্পিয়ন অব হিন্দুইজম' হিসেবে বন্দনা করলেন। শিখ সম্প্রদায় বান্দা এবং গুরুগোবিন্দভজনায় মত্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজপুত বীরত্বকে উপজীব্য করে উপন্যাস লিখলেন। কবিরা হিন্দু বীরদের প্রশস্তি গাইলেন। মারাঠা, রাজপুত, জাঠরা তাঁদের কবিতার বিষয় হল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করলেন। ভেবে বিস্মিত হতে হয় রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো রক্ষণশীল ঐতিহাসিকও লেখেন, 'এমন-কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, বান্দা এবং রাজপুত বীরদের নিয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এমন কবিতা লিখলেন কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে নীরব রইলেন।'[৫২] বিকৃত ইতিহাসচেতনার ফলেই বহু জাতীয়তাবাদী নেতাও বলে বসেন ভারত প্রায় এক হাজার বছর ধরে বিদেশী শাসনের মধ্যে ছিল এবং 'মুসলিম শাসনে' এদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অবক্ষয় হয়েছে। প্রাচীন মূল্যবোধের ধ্বংসের কারণও হল 'বিদেশী মুসলিম শাসন'। যে-কোনো সেকুলার মানুষ উপলব্ধি করবেন যে এই বোধ কতখানি বিপজ্জনক। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরাও একে অপরকে 'ভিলেন'রূপে চিত্রিত করতে উৎসাহী।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত হিন্দু দেশীয় রাজ্যগুলোর যশোগানে বিভোর হলেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। এমন-কি তুচ্ছ হিন্দু জায়গীরদারদের বিদ্রোহকেও 'হিন্দু বীরত্বে'র প্রকাশ হিসেবে গণ্য করলেন। এইভাবে বহু ব্রিটিশ-ভজনাকারীও দেশপ্রেমিক সাজলেন। এই জাতীয়তাবাদ-চর্চার মাধ্যমে ইতিহাস হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতার লালনভূমি। এই 'বিভ্রমসৃষ্টিকারী জাতীয়তাবাদে'র প্রতিক্রিয়ায় 'মুসলিম জাতীয়তাবাদে'র উদ্ভব হল। কেউ প্রশ্ন তুললেন না, ১৯০১ সালে রাজপুতানায় রাজপুতরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ৬·৪% ভাগ মাত্র। সে সময়ে সংখ্যায় কত ছিলেন? স্মর্তব্য হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল ১৫৭৬ সালে। রানা প্রতাপ তাহলে কাদের নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন? মোগল আকবর কি জন্মের সুবাদে মুসলমান বলেই বিদেশী? অথচ আকবরকে তাঁর 'সুল-ই-কুল'-নীতির জন্য প্রশংসা করি। নিজের হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্যই রানা সংগ্রাম করেছিলেন। উপরন্তু তিনি আঞ্চলিক নেতা। জাতীয় নেতা নন। শিবাজী যে 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন হিন্দুস্তানের জনমানসে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমরা জানি না। উপরন্তু এঁরা কি কোনো বিদেশী প্রভুর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন? এমন সব সংগত প্রশ্ন তুলেছেন আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বিপন চন্দ্র। রানা প্রতাপ, শিবাজীকে 'জাতীয় মহাপুরুষ' হিসেবে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেন, কিন্তু ঝাঁসির রানী, তাঁতিয়া, মৌলানা আহমদুল্লাহ কুঁয়ার সিংহ উপেক্ষিত হলেন, কেননা তাঁরা একজন মুসলমানকেই 'সম্রাট' হিসেবে স্বীকার করেছিলেন। অশোক, চন্দ্রগুপ্তকে 'জাতীয় বীর' বলা হয় নি কেননা এঁদের কোনো মুসলমান শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু শিবাজী, রানাপ্রতাপ করেছেন। ফলত এঁরা 'জাতীয় নায়ক'। বাজীরাও এবং সুরজমল ও 'জাতীয় সম্মানে'র পাত্র। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে রানাপ্রতাপ এবং শিবাজী নিঃসন্দেহে বীর। কেননা তাঁরা বিশিষ্ট হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতের জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী আন্দোলনের চরমপন্থীদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে এখনও কম গবেষণা হচ্ছে না। প্রায় ক্ষেত্রে নানান উদাহরণ তুলে তাঁদের উদার হিসাবে চিহ্নিত করার ঝোঁক এই গবেষণায় বর্তমান। কেমব্রিজে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা শোনার পর নেহরু বুঝে-ছিলেন যে সেই বক্তৃতায় 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর প্রখর প্রকাশ ছিল এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি বিদ্বেষ পোষণ করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, ১৯০৭ সালের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং 'ধর্মীয় জাতীয়তা-বাদ'। আমরা বিস্মিত হই এই কারণে যে নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত হিন্দু মহাসভা সৃষ্টির উদ্যোগে সাহায্য করেছিলেন। এই মতটি প্রকাশ করেছেন এম. জে. আকবর "বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপট" নামক একটি নিবন্ধে ("দেশ", ৬ জুন, ১৯৮৭)।

হাল আমলে এই বিষয়ে যে নির্মোহ মূল্যায়ন শুরু হয়েছে, সেগুলো ইতিহাসচর্চা ও পঠন-পাঠনে এখনও ব্যাপক কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেটি সীমিতাংশে আলোচনা করা যাক। এ বাবদে অমলেন্দু দে, অমলেন্দু গুহ এবং বিপন চন্দ্রের মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করা গেল।

'১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনায় কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেন, এই আন্দোলনের 'স্টাফ হিন্দু টিনজ' বা প্রকট হিন্দু রঙ ছিল।·· ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমার্থক। ···তাঁরা··· 'এরিয়ান আইডিয়ালস' বা 'আর্য আদর্শ' দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। সুতরাং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল পুরোপুরি হিন্দু।'[৩৩] এই প্রসঙ্গে বিপনচন্দ্র লেখেন, 'বহু চরমপন্থী জাতীয়তা-বাদকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং

জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবেই মনে করেন।'[৩৪] অরবিন্দ ঘোষ ভবানী বা শক্তিমাতার (ভবানী দি মাদার অব স্ট্রেঙথ) আরাধনা করে মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দিতেন। এঁদের কাছে এই দেশ ছিল 'ভবানী ভারতী' বা 'ভারতমাতা'। এই আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 'হিন্দু সিমবলস', 'মীথস', 'ইডিয়মস' মুসলমানদের ভীত করে তোলে। অমলেন্দু গুহ একই মূল্যায়ন করেছেন "ভারতের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতা" নামক বহু মূল্যবান আলোচনায়।[৩৫] গান্ধীর 'রামরাজ্যের' প্রতি ঝোঁকও জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াল। শুধু জিন্নাহকে দোষ দিয়ে কী হবে? বিপন চন্দ্র উদ্দেশ্যমূখী বিশ্লেষণ করেন এইসব ভণ্ডামির। কলেজ-স্কুল শিক্ষকরা এ নিয়ে ভাবিত নন। ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। [জিন্না প্রসঙ্গে কৃষ্ণা বসুর "কায়েদ ই-আজম্ জিন্না ও ভারতভাগ" নিবন্ধটি পড়ুন, দেশ, ১৫ অগস্ট, ১৯৮৭]।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভূমিকারও যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি। বিশেষ-সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর কথাই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হল। এভাবে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 'এই বিশাল অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রথমে দেখা দেয় কৃষক, কারিগর, আদিবাসী এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে। তাঁরাই প্রথমে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন করেন।'[৩৬] ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া (১৮১৮–১৯৪৭), এমনকি, ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলনে যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হয় তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নি। স্বাধীনতালাভের পর কিছু নিরপেক্ষ আলোচনা হলেও জনমানসে তা ব্যাপকতা পায় নি।[৩৭]

ভারত-ইতিহাস চর্চায় অপপ্রচারের আর-একটি নতুন ক্ষেত্র খুঁজে-পেতে বের করা হয়েছে—সেটি হল স্থাপত্যশিল্পের জগৎ। বিশেষ এক ধরনের ঐতিহাসিক এটি প্রমাণ করতে প্রাণপাত চেষ্টা করছেন যে তুর্ক-আফগান ('পার্শোটার্ক' নামেও পরিচিত। 'Turkis in race but Persian in culture'—Amalendu De, Islam in Modern India, Page-2) ও মোগল যুগের বহু মসজিদ, মন্দির থেকে রূপান্তরিত। বাবরি মসজিদের কথাই বলছি না। 'বিস্মিত' হবেন এটি জেনে যে পি. এন. ওক নামে জনৈক ইতিহাসগ্রন্থপ্রণেতা ব্যাপক প্রচার করেছেন যে তাজমহল মূলত হিন্দু মন্দির। বহু শিক্ষক বইটি পকেটে রাখেন। মন্ত্রকা-মতো ছাত্রদের পড়ে শোনান। কিংবা মতবাদটি বিশদ আলোচনা করেন। এইসমস্ত শিক্ষক জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। কোমল-মতি ছাত্রছাত্রীদের মনটিকে বিষিয়ে দিচ্ছেন।

হাল আমলে কতিপয় ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাসের নির্মোহ মূল্যায়ন (ড. ইরফান হাবিবের মতে 'সেক্যুলার অ্যানড সায়েনটিফিক হিস্ট্রি') শুরু করেছেন।[৩৮] উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলেই তা আলোচিত। এইসব আধুনিক বস্তুবাদী মূল্যায়নগুলো পাঠ্যপুস্তকের অন্তরভুক্ত হওয়া একান্ত জরুরি। তাহলেই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। বিবেচ্য বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে এই আলোচনায় শুধুমাত্র ইতিহাসচর্চার বিষয়টিই আলোচিত হল। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। সাহিত্যে, শিল্পে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে, নন্দনতত্ত্বে (এই প্রসঙ্গটি বরুণ দে উত্থাপন করেছেন), সিনেমা-থিয়েটারে পাঠ্যপুস্তকে, প্রাত্যহিক জীবনে, সর্বোপরি রাষ্ট্র-পরিচালনপদ্ধতিতে সেকুলারি-জমের চর্চা জরুরি।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বিপন চন্দ্র, "কমিউনালিজম ইন মডার্ন ইনডিয়া"; পৃ ৩৪।

২. বরুণ দে, সাক্ষাৎকার, যুগান্তর সাময়িকী ; ৫ জুলাই, ১৯৮৭।

৩. অশীন দাশগুপ্ত, "সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাসচেতনা" 'ইতিহাসচর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ ; সম্পাদক, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৬৫।

৪. জি. আর. খ্যাসবি, "হিন্দু মুসলিম রিলেশন্‌স্ ইন ব্রিটিশ ইনডিয়া" ; প্রভা দীক্ষিত, "কমিউনালিজম— এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার" ; এ. কে. ভকিল, "থ্রি ডাইমেনশনস অব হিন্দু-মুসলিম রিলেশন্‌স্" ; ফ্রানসিস রবিনসন, "সেপারেটিজম অ্যামং ইনডিয়ান মুসলিমস" ; অশোক মেহতা এবং অচ্যুত পট্টবর্ধন, "দ্য কমিউনাল ট্র্যাজেডি ইন ইনডিয়া" ; উইলফ্রেড ক্যানটেওয়েল স্মিথ, "মডার্ন্ ইসলাম ইন ইনডিয়া" এবং এ. আর দেশাই-এর "সোসাল ব্যাকগ্রাউনড অব ইনডিয়ান ন্যাশনালিজম" গ্রন্থে এ আলোচনা রয়েছে। ১৯৮৪-তে প্রকাশিত বিপন চন্দ্রের অসাধারণ কাজটি হল, "কমিউনালিজম ইন মডার্ন্ ইনডিয়া"।

৫. "কমিউনাল ইউনিটি" (গ্রন্থ) ; পৃ ২১০।

৬. বিপন চন্দ্র, "কমিউনালিজম ইন মডার্ন্ ইনডিয়া" ; পৃ ২১০।

৭. ঐ, পৃ ২১০।

৮. ঐ, পৃ ২১০-২১১।

৯. ঐ, পৃ ২১১।

১০. ঐ, পৃ ২১১।

১১. বিপন চন্দ্র, "আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক ও সাম্প্রদায়িকতা" (প্রবন্ধ) "সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা" (গ্রন্থ) ; পৃ ৫৩, [অনুবাদ তনিকা সরকার]।

১২. বিপন চন্দ্র, "কমিউনালিজম ইন মডার্ন্ ইনডিয়া" ; পৃ ২০৯।

১৩. ঐ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২০৯, নোট ১।

১৪. "মুক্তমতি বুদ্ধিজীবী ইরফান হাবিব", সাক্ষাৎকার, গৌতম নিয়োগী, দেশ, ২৫শে মে ১৯৮৭।

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "দ্য বিগিনিং অব এ নিউ এজ" —লেকচার ১ (For private circulation only). পৃ ৪।

১৬. ঐ, পৃ ৪।

১৭. বিপন চন্দ্র, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৬৩-৬৩।

১৮. বিপন চন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃ ২১২-২১৩।

১৯. ঐ, পৃ. ২১৩।

২০. রমিলা থাপার, "সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা" (প্রবন্ধ)। 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা' (গ্রন্থ), পৃ ১৪-১৫, [অনুবাদ তনিকা সরকার]।
২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ রমিলা থাপার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ যথাক্রমে—১৬, ১৭, ১১, ১৮ এবং ১৮। 'হিন্দু' সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন "দ্য ডিসকভারি অব ইনডিয়া" (নেহরু) ; পৃ ৭৪ (What is Hinduism ?)

২৬. "মুক্তমতি বুদ্ধিজীবী ইরফান হাবিব" ; সূত্র, পূর্বোক্ত।

২৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "দর্শন ও রাজনীতি" ; 'চতুরঙ্গ', বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৭, নভেম্বর ১৯৮৭। তাঁর একটি উদ্ধৃতি, 'মনু বলেছেন, শাস্ত্রে আছে যে নিছক দাসত্ববৃত্তির জন্যই স্বয়ং ভগবান শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন।' (মনু ১।৯১ ; ৮।৪১৩-৪১৪)।

২৮. রমিলা থাপার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ২৩।

২৯. হরবংশ মুখিয়া, "মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি" (প্রবন্ধ) ; 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা' (গ্রন্থ), পৃ ৪৭। [অনুবাদ তনিকা সরকার]।

৩০. অশীন দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৬৬।

৩১. ঐ, পৃ ৬৮।

৩২. অসিতকুমার সেন, "মধ্যযুগের ইতিহাসে ঐক্যের ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে", (প্রবন্ধ) ; 'ইতিহাস অনুসন্ধান' (গ্রন্থ), [সম্পাদনা গৌতম চট্টোপাধ্যায়], পৃ ৬৬।

৩৩. হরবংশ মুখিয়া, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৪৪।

৩৪. সুশোভন সরকার, "মার্কসের চোখে ভারতীয় ইতিহাস" (প্রবন্ধ) 'ইতিহাসচর্চা' (গ্রন্থ), পৃ ১০১-১০২।

৩৫. হরবংশ মুখিয়া, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৪৫।

৩৬. অসিতকুমার সেন, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৫০।

৩৭. হরবংশ মুখিয়া, সূত্র, পূর্বোক্ত ; পৃ ৫১।

৩৮. ঐ, পৃ ৪২-৪৩।

৩৯. সতীশচন্দ্র, "কমিউনাল ইনটারপ্রিটেশন অব ইনডিয়ান হিস্ট্রি" (পুস্তিকা) ; 'ইতিহাস অনুসন্ধান' ; পৃ ৫৩।

৪০. হরবংশ মুখিয়া, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৩৯।

৪১. সতীশচন্দ্র, পূর্বোক্ত পুস্তিকা।

৪২. আতাহার আলি, "দ্য মুঘল নোবিলিটি আনডার আওরঙ্গজেব" ; পৃ ৩১।

৪৩. ইরফান হাবিব, "এগরেরিয়ান কজেস অব দি ডাউনফল অব দি মুঘল এমপায়ার" (এনকোয়ারি, ২য় খণ্ড, ১৯৫৯) ; গৌতম ভদ্র, "মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ" ; আতাহার আলি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, সতীশচন্দ্র, "পার্টিজ অ্যানড পলিটিকস অ্যাট দি মুঘল কোর্ট"। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে মুজফ্‌ফর আলমের "দ্য ক্রাইসিস অব এমপায়ার ইন মুঘল নর্থ ইনডিয়া"। উপরন্তু তপন রায়চৌধুরীর মূল্যবান গবেষণাকর্ম রয়েছে।

৪৪. সতীশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং তার বাংলা সংস্করণ "মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি" ; আতাহার আলি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং তার বাংলা সংস্করণ 'আওরঙ্গজেবের দরবারে মুঘল অভিজাত শ্রেণী'।

৪৫. ক্ষিতিমোহন সেন, "ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা" ; জগদীশনারায়ণ সরকার, "বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক" (মধ্যযুগ) ; ড. এম. এ. জলিল, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক" —বাংলাদেশ।

৪৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বাস করেন, 'The Hindus and Muslims, throughout the nine hundred years, formed two distinct communities separated by the iron bars of religious and social ideas'—পূর্বোক্ত বক্তৃতা, পৃ ৮ এবং দেখুন রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তির উদ্ধৃতি ; বিপন চন্দ্র, "কমিউনালিজ ইন মডার্ন্ ইনডিয়া", পৃ ২১৫, নোট ১২। ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু সাহিত্যের কবিদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল—'They were in India but not of India'—সূত্র, পূর্বোক্ত বক্তৃতা ; পৃ ৭। ড. এস. কে. চাটার্জী একই মত পোষণ করেন। সেটি বক্তৃতায় উদ্ধৃত করেছেন ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ ৭

৪৭. হরবংশ মুখিয়া, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৫২।

৪৮. বিপন চন্দ্র, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ; পৃ ৬৬।

৪৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "দ্য বিগিনিং অব এ নিউ এজ" —লেকচার ১ ; পৃ ২। [কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে থাকেন যে অতীতের দিন থেকেই বিশাল ভারতবর্ষের ধারণাটি ক্রিয়াশীল ছিল, যেমন স্নানমন্ত্রে গঙ্গা কাবেরী প্রভৃতি সাতটি নদীর নাম রয়েছে। আদি শংকরাচার্য দেশের চারপ্রান্তে চারটি ধাম প্রতিষ্ঠা করে এদেশকে একদেশরূপে গঠন করেছেন। উপাসনায় ব্রহ্মা, সমাজশাসনে ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রতীক হন। ইত্যাদি ইত্যাদি।]

৫০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত বক্তৃতা ; পৃ ৫।

৫১. ঐ, পৃ ৫।

৫২. ঐ, পৃ ৬। (মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছিল গোপালরাও হরিদেশমুখ, ভাস্কর পাণ্ডুরঙ, বিষ্ণুকৃষ্ণ চিপলংকার, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপাল গণেশ আসরকর এবং তিলককে কেন্দ্র করে। স্বামী দয়ানন্দ আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করে পানজাবে হিন্দুবাদের প্রচার করেন। শুদ্ধি আন্দোলন মারফত 'কমন রিলিজিয়ন অ্যানড কালচার' অর্থাৎ হিন্দুবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করেন।) আরও দেখুন এ. আর. দেশাই, "ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি", পৃ ১১৯।

৫৩. অমলেন্দু দে, "ভারতের জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী আন্দোলন"; 'চতুরঙ্গ', মার্চ, ১৯৮৬।

৫৪. উদ্ধৃতি, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ; 'চতুরঙ্গ' মার্চ, ১৯৮৬।

৫৫. অমলেন্দু গুহ, "ভারতের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রশ্ন"; 'চতুরঙ্গ', জুন, ১৯৮৭। এবং দেখুন অমলেন্দু দের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৫৬. অমলেন্দু দে, "ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ", 'চতুরঙ্গ', বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৭, নভেম্বর ১৯৮৭।

৫৭. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, 'চতুরঙ্গ' নভেম্বর, ১৯৮৭, এবং 'ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন' 'চতুরঙ্গ', মার্চ ১৯৮৬।

৫৮. প্রাচীন ভারত সম্পর্কে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন ডি. ডি. কোশাম্বী। তিনি একজন গণিতবিদ এবং পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক। এরপর রামশরণ শর্মা, রমিলা থাপার বহু প্রশ্ন তুলেছেন। ভারত ইতিহাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করেছেন হরবংশ মুখিয়া, বিপন চন্দ্র, ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, ইকতিদার আলম খান ("মুঘল নোবিলিটি অ্যানড আকবরস বিলিজিয়স পলিসি"), বরুণ দে, অমলেন্দু গুহ, মুশিরুল হাসান, রণজিৎ গুহ, আতাহার আলি, সুনীল সেন, অমলেন্দু দে, সৈয়দ সুরুল হাসান, কে. এন. পানিক্কর, সুমিত সরকার, রফিউদ্দিন আহমেদ, চিত্তব্রত পালিত (Revolt Studies), আলাউদ্দিন আহমেদ, শিরিন মুসভি প্রমুখ। অধ্যাপক শেখ আব্দুর রসিদ, অধ্যাপক সুরুল হাসান এবং অধ্যাপক মুহম্মদ হাবিবের ইতিহাস-চর্চার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ড. ইরফান হাবিব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য পানাজিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের স্বর্ণজয়ন্তী মঞ্চ থেকে ডি. এন. ঝা, গোপাল সিং, কে. এম. শ্রীমালি এবং ইরফান হাবিব 'সেক্যুলার অ্যানড সায়েনটিফিক টেকসট্ বুক' রচনার দাবি জানিয়েছেন। এখানেই অধ্যাপক দ্বিজেন ঝা দূর-দর্শনের সিরিয়াল 'রামায়ণ' এবং 'বাহাদুর শাহ জাফর'-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দারুণ তর্ক-প্ররোচক হয়ে উঠেছে বিষয়টি।

দেশবাসী আর আদিবাসী

কমলেন্দু ধর

আমরা দেশবাসী নই, আমরা আদিবাসী। বা বলতে পারেন, যারা দেশবাসী নয়, তারাই আদিবাসী। কথাগুলি আমার নয়। মধ্যপ্রদেশের থেঁরোওয়ার আদিবাসীদের একজনের—শোঁয়ানের। না, কোনো প্রান্তিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে এ কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে নি। দেশের ডানবামদক্ষিণমধ্য সর্বস্তরের দেশবাসী যখন দেশের স্থায়ী সাম্প্রদায়িকতা আর চকিত বিচ্ছিন্নতায় উদ্বিগ্ন, তখনও আদিবাসীরা ভয়ার্ত-অরণ্যভূমি-নির্ভর অথবা পরাধীন শ্রমদাস-যন্ত্রণায় আদিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত। স্বাধীনতা গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র সংবিধান জরুরি অবস্থা বহুজাতিক সংস্থা মডেল-স্কুল বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বা একবিংশ শতাব্দী—শব্দগুলি এখনো তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় নি। দৈনিক সংবাদ-পত্র আর দিনভর ক্রিকেটের ব্যঞ্জনা নিয়ে যে গরিষ্ঠ দেশবাসীর ব্যস্ততা, তাঁরা সময়ে অসময়ে কখনো-সখনো শব্দগুলির অর্থ আর তার গুণগত বিভাজনপর্ব নিয়ে যখন তর্কের তুফান তোলেন, তখন ওঁরা এই শব্দতরঙ্গের বাইরে মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ হেঁটে চলেছেন সামান্য পানীয় জলের জন্য। বাকি সামান্য কিছু দেশবাসী যাঁরা শব্দগুলির দ্যোতনা বোঝেন এবং অপরকে বোঝাতে প্রয়াস চালান—তাঁরাও সেই প্রান্তসীমার মানুষগুলির থেকে এখনও বিস্তৃত ব্যবধানে তাঁদের কর্মপ্রবাহে ব্যস্ত। তাই "দেশবাসী আর আদিবাসী" শব্দ দুটির মধ্যে যে ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এক আলোকিত থেঁরোওয়ার যুবকের মধ্যে, তা হল: ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশের বেশি মানুষ কেন এখনও দেশবাসী না হয়ে আদিবাসী হয়ে রইল তারই মর্মান্তিক প্রেক্ষাপট আর উপলব্ধি। এই প্রেক্ষাপট আর উপলব্ধির চেতনাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আলোচনাটি আমরা পাঁচটি পর্বে ভাগ করে নেব। প্রথমত আমরা জেনে নেব, কবে কিভাবে দেশবাসী

আর আদিবাসী বিভাজনপর্বটি প্রশাসনে স্বীকৃত হল, এবং তাদের আবাসভূমি। দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীনতা-পূর্ব একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রে আমরা তুলে ধরব এই মানুষদের জীবন-জীবিকাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে দেশবাসীর তথা দেশীয় প্রশাসনের এঁদের নিয়ে বৈচিত্র্যময় কর্মযজ্ঞ। চতুর্থ পর্বে আমরা দেখাবার চেষ্টা করব—কিভাবে দেশ তথা দেশবাসী এগিয়ে চলেছে এবং এই নিম্নবর্গীয়রা নিঃস্ব হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে এদের সামাজিক অবস্থানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকরা পাবেন। সবশেষে এই আলোচনার প্রেক্ষায় উপসংহারের বদলে কয়েকটি কথা বলতে চাই—যার বিস্তৃত পর্যালোচনায় এখানে আমরা যাব না। একটি বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার করে নেবার প্রয়োজন আছে, তা হল 'তফশীল জাতি / উপজাতি', 'হরিজন', 'অচ্ছুত', 'অন্যান্য অনুন্নত জাতি' —সব অর্থে সমগোত্রীয় নয় জেনেও প্রথম পর্বে আদিবাসী কথাটি একটু বিস্তারিত করে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছি—সমগ্র অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে। কারণ, শুধু আদিবাসী নয়, এই সমগ্র বিভিন্ন-নামাঙ্কিত বিভাজনটি শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, অমানবিকও বটে। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে যদিও আমরা তা-ই বহন করে চলেছি। এবং দ্বিতীয় পর্ব থেকে এই সমগ্র পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে 'মানুষ' বলে উল্লেখ করেছি : অর্থ নৈতিক-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষ।

১

একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী থেকে ক্রমপর্যায়ে কিছু-কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে, বিচ্ছিন্ন করে কখন কারা আদিবাসী তকমায় চিহ্নিত করে দিল, তাই প্রথমে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষে নানান ধারার জ্ঞানচর্চার যে নতুন কাঠামোটি গড়ে ওঠে, তা মূলত সাম্রাজ্যবাদী-শাসন-নীতি-আশ্রয়ী। ঔপনিবেশিক দেশগুলির বহমান জনজীবনের সকল প্রবাহের প্রচলিত সামাজিক আদানপ্রদান আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি প্রথা-ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেবার প্রয়োজন খুবই জরুরি হয়ে পড়ে —সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ চালাবার তাগিদে। এসব জানা থাকলে অহেতুক বিরোধকে এড়িয়ে শাসিত দেশের জনজীবনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা যায়, এবং বিভিন্ন ধারার সামাজিক বিক্ষোভকেও কৌশলে দমন করা সম্ভব হয়।

এদেশের সংস্কৃতিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রয়ে আর প্রশ্রয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে বাঙলার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় এবং স্যার উইলিয়াম জোনসের প্রেরণায় ভারতবর্ষেও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। ১৮৮৬ সালে বোমবাইতে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর পরই আমরা দেখতে পাই করনেল ড্যালটন, স্যার ডেনজিল ইবেটসন, স্যার হারবার্ট রিজলে এদেশের সকল স্তরের মানুষের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধান শুরু করেন। এই অনুসন্ধানের ফসল করনেল ড্যালটনের "ডেসক্রিপটিভ এথনলজি অব বেঙ্গল", হারবার্ট রিজলের "ট্রাইবস অ্যানড কাস্ট্‌স্ অব বেঙ্গল"। তারপর মধ্যভারত, দক্ষিণ-ভারত আর আসামের বিভিন্ন জাতি আর উপজাতিদের নিয়ে একের পর এক বই প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ সালে প্রাথমিক-ভাবে ভারতবর্ষের জনগণনা শেষ হয়। এবং ১৮৮১ থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর নিয়মিত জনগণনার কাজ চলতে থাকে। এই সময়ই সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশের কিছু-কিছু মানুষকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন করে আদিবাসী ছাপ মেরে তফশীলভুক্ত করা হয়। এর আগে এইসব মানুষকেই বিভিন্ন সময়ে 'জংলি মানুষ', 'বন্য মানুষ', 'আদিম অধিবাসী', 'অনুন্নত জাতি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বস্তুত এক কৃত্রিম জনবিন্যাসের

তত্ত্বই দেশের মানুষের একাংশের সরকারি পরিচয় ঘটে আদিবাসী তথা 'অনুন্নত জাতি' বলে। ১৯০১ সালে সেনসাস কমিশনার নিযুক্ত হয়ে স্যার হারবার্ট রিজলে যে রিপোর্টটি পেশ করেন তার শেষে এথনোগ্রাফিক অ্যাপেনডিকস জুড়ে দেন—তা-ই "দ্য পীপল অব ইনডিয়া" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৮-এ। এই গ্রন্থে স্থান পায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জাতি-তত্ত্ব, আর তাদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে রিজলের সংগৃহীত তথ্য, এবং তাঁর নিজস্ব মতামত। এর ফলে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এক বড়ো অংশ তফশীল জাতি / উপজাতি বলে প্রশাসনে আর জনমানসে পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য সরকারি ভাষ্যে এই তফশীলভুক্ত গোষ্ঠীর বাইরেও কিছু-কিছু 'অন্যান্য অনুন্নত জাতি' আছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষেও তাঁরা পরিচয়ের এই স্বমহিমাতেই বিরাজ করেন। এবং স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও তাঁরা দেশবাসী নয়, আদিবাসী হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

আদিবাসী তত্ত্বের অপপ্রয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করব না। এই অবৈজ্ঞানিক কর্মধারা সম্পর্কে শুধু একটিমাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। উদ্ধৃতিটি ড. ভেরিয়ার এলউইনের :

'Our science has been debased in the interest of false racial theories...Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain scholars and politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu community at the time of census created the impression that science could be diverted to political and communal ends.'[১]

এই সূত্রে আমাদের বক্তব্য : 'হিন্দু কমিউনিটি' থেকে নয়, দেশের জনগোষ্ঠী থেকে কিছু-কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে এজাতীয় তকমা দেওয়ার প্রহসনকে তুলে ধরা এবং তাকে অস্বীকার করা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নানা মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে এদেশে, এখনও ঘটছে। ঐতিহাসিক যুগে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলি দিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে নানা মানুষের নতুন-নতুন প্রবাহ এসে মিশেছে ভারতীয় জনসমুদ্রে। উত্তর-পূর্ব থেকেও এ সংমিশ্রণের ধারা থেকেছে অব্যাহত। সুতরাং ভারতবর্ষের বর্তমান জনগোষ্ঠীকে কোনো প্রধান মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা আবির্ভাব বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তারা আভ্যন্তরীণ আর বহিরাগত একটির পর একটি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ক্রমাগ্রসরমান। তাই একথা খুব সহজেই বলা যায়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীতে কোনো অমিশ্র জাতি বা গোষ্ঠী আদৌ নই। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী হেডনের মতকে অনুসরণ করে বলা যায়, 'A race type exists only in our minds.'। ফলত, ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানচর্চার ধারাকে অনুসরণ করতে হলে তফশীলভুক্ত আর অন্যান্য পশ্চাৎপদ মানুষগুলিকে বেওয়ারিশ আর অজ্ঞাত দুনিয়ার মানুষ হিসাবে কষ্টসাধ্য ভাবনা ভাবতে হয়।

২

দেশবাসীরা যে-সমস্ত অঞ্চলের সৌন্দর্যচ্ছটায় বারবার আবেগতাড়িত হন, সেই পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্র-ঘেরা স্বপ্নময় অনুন্নত স্থানগুলি জুড়েই অধিকাংশ আদিবাসীদের বাস। অবশ্য এই স্থানগুলির এক বড়ো অংশই আধুনিক সভ্যতা আর প্রগতির মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। আর এই সম্পদের উপর নির্ভর করেই দেশ এগিয়ে চলে, দেশবাসীরা সম্পন্ন হয়, বুদ্ধিজীবীরা (আদিবাসীদের) 'আদিকল্পে' বিভোর হন—ঠিক তখনই তারা আরো বেশি করে দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অনুন্নত হয়, নিঃস্ব হয়। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা থেকে আরম্ভ করে একটি উচ্চ-ভূমির অঞ্চল বিন্ধ্য কৈমুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এর পশ্চিমে মালব মালভূমি। মধ্যভারতের মালভূমি

মালবের উত্তরে আরাবল্লী থেকে পূর্বভারতের রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভারতের এই মালভূমির পূর্বের অংশ ছোটনাগপুর মালভূমি। ছোটনাগপুরের মালভূমি দক্ষিণ-পূর্ব উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের এই উচ্চভূমি, উত্তর মধ্যভারতের এবং দক্ষিণে ছোটনাগপুরের মালভূমিকে যুক্ত করেছে। এই বিস্তৃত উচ্চভূমির পূর্বে মহানদীর উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী পূর্ব উপকূল বরাবর প্রসারিত হয়ে নীলগিরি পর্বতে পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর সাথে মিলেছে। নীলগিরির দক্ষিণে আন্নামালাই, পুলনি প্রভৃতি পর্বত। এই বিস্তৃত অংশেই প্রধানত আদিবাসী মানুষদের অবস্থান। এর বাইরেও বছরের পর বছর পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ হয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু আদিবাসী।

স্বাধীনতার পূর্বে আদিবাসীদের সম্পর্কে উল্লিখিত কাঠামোকে অস্বীকার করার কোনো প্রবণতা বা প্রচেষ্টা বিশেষভাবে না পেলেও কয়েকটি উজ্জ্বল নাম আমরা পাই যাঁরা এই নিঃস্ব মানুষদের নিয়ে ভেবেছেন, এদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অন্তত এদের দাসত্বের জীবনবন্ধনকে ছিন্ন করে মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছেন। সর্বাগ্রে উজ্জ্বল নামটি হল জ্যোতিবা ফুলে, যদিও তাঁর "সত্যসাধক" আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে নি। এর পর গান্ধীজী, আম্বেদকর, পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী ও অন্যান্য ব্যক্তির নাম এসে পড়ে। জ্যোতিবা ফুলে নিপীড়িতদের চেতনার রূপান্তর ঘটাতে আজীবন লড়াই করে গেছেন ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে। স্থির লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি জাতপাতে দীর্ণ হিন্দু সামাজিক বিন্যাসের সমস্ত রকম অন্যায়, অসত্য আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আপোসহীন আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। জ্যোতিবা ফুলে একদিকে যেমন আর্যতত্ত্বের নোংরা অনাচার উদ্ঘাটনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অন্যদিকে সবার সমানাধিকার, হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চানদের সমতার দাবি, নীচু বর্ণের শিক্ষা, নারীপুরুষের সমানাধিকার তথা পুরনো সামাজিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। জ্যোতিবা ফুলের জীবনীলেখক কীয়ার "লোকহিতবাদী" থেকে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন : 'কৃষকরা এমনকি খরা বা দুর্ভিক্ষের সময়েও প্রাপ্য খাজনা দিতে অসমর্থ হলে তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের গরম কড়াই থেকে ফুটন্ত তেলে ঢালতেন, তাদের ন্যুব্জ পিঠের ওপর চাবুক মারার অনুশীলন চলত, তাদের মাথা গুঁজে দেওয়া হত দমবন্ধকরা ধোঁয়ার মধ্যে, তাদের নাভিদেশে আর কানে বারুদ ছড়িয়ে দেওয়া হত।' এই কৃষকরা অধিকাংশই হল সেই মানুষ যারা নীচু জাতের।

আর এদের উন্নতির জন্য 'গান্ধীজীর কার্যকলাপ যে কত ছিল সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলারই দরকার করে না'—মন্তব্যটি "গান্ধী-গবেষণা" গ্রন্থের লেখক প্রবীণ পান্নালাল দাশগুপ্তের। গান্ধীভাষ্যে আদিবাসী অচ্ছুৎ অনুন্নত গোষ্ঠীর একটা নতুন পরিচয় ঘটে "হরিজন" বলে। যদিও পণ্ডিত নরসিং মেহতা "হরিজন" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তবুও গান্ধীভাষ্যের কল্যাণেই "হরিজন" শব্দটি আমাদের অনেক কাছাকাছি চলে আসে। গান্ধীজীর বিস্তৃত 'অনশন সত্যাগ্রহ'-এর ছুটি মূল্যবান পর্ব ব্যয়িত হয় এই অনুন্নত তথা হরির জনদের উন্নয়নকল্পে। একবার ১৯৩২ সালের সেপটেম্বর মাসে, আরেকটি ১৯৩৩ সালের মে মাসে বিখ্যাত ২১ দিনের অনশন সত্যাগ্রহ। গান্ধীজীর কল্পিত "রামরাজত্বে" একদিন এই-সমস্ত মানুষের "কল্যাণ" হবেই বলে তিনি মনে করতেন। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, সমাজটা যেমনই থাকুক, মানুষ যদি ভালো হয় তবে সব সমাজ দিয়েই মানুষের চলতে পারে। এই সূত্রেই তিনি সমাজটা না পালটে আদিবাসী তথা হরিজনদের কল্যাণে দেশবাসীকে, কংগ্রেসকে আত্মনিয়োগ করতে বারংবার আবেদন করেছেন, বলেছেন "হৃদয় পরিবর্তন" করে তাদের কল্যাণে লেগে পড়তে। সত্যিই তো—কারো আহ্বানে সমস্ত মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন হয়ে গেলে সমাজটা পালটাবার আর দরকার কী? গান্ধীজীর মতো সবাই যদি 'ম্যায় ভাঙ্গী হুঁ' বলে হৃদয়-পরিবর্তন করে ফেলেন, তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়! তাই মহাত্মাসুলভ ভঙ্গিমায় মহাত্মা গান্ধীই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও সগর্বে বলতে পারেন : (ক) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং সমস্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে—এবং সে কারণে অবতারবাদে আর পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, (খ) আমি বর্ণাশ্রমধর্মে বিশ্বাস করি, এবং তা পুরোপুরি বৈদিক অর্থে, আজকের প্রচলিত আর স্থূল অর্থে নয়, (গ) আমি মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস করি না।[২]

এই গান্ধীজী যখন রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যগগনে গনগন করছেন, তখন দেশের এই মানুষদের অবস্থা কেমন ছিল? গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান শিষ্য বা আদর্শবাহকের দাবিদার মোরারজী দেশাইয়ের ভাষ্যেই আমরা তা তুলে ধরছি। ১৯৩৯ সালের ২৫শে সেপটেম্বর, বোমবাই প্রদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব-মন্ত্রী মোরারজী দেশাই আইনসভায় 'প্রজাস্বত্ব আইনের' উপর ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—'থান্দেশ জেলার ভীল অঞ্চলে বা থানা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক বছর আগেও এই মানুষগুলিই (বিভিন্ন আদিবাসীরা) ছিল সমস্ত জমির মালিক। কিন্তু খারাপ সময়ে দুর্ভিক্ষে বা দুষ্প্রাপ্যতার দিনগুলিতে, অভাবের তাড়নায়, সামান্যতম মূল্যের বিনিময়েই জমিগুলি তাদের হাত থেকে 'সাহুকরদের' দখলে চলে গেল। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে—যেখানে কয়েক একর জমি মাত্র পাঁচ পাউন্ড খাদ্যশস্যের বিনিময়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একর-পিছু পাঁচ টাকা বা এক টাকা, এমনকি আট আট আনাতেও।' আরেকটি চিত্রও আমরা পাই। বোমবাই প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বি. জি. খের ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই "আদিবাসী সেবামণ্ডলে"র পক্ষ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় বলেছেন—'বোমবাই থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই, মনুষ্যজাতির এক বিশাল অংশ যে এইভাবে ক্রীতদাসের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে পচতে-পচতে ক্ষয় হয়ে যাবে, এবং আমাদের উন্নাসিক নাগরিকরা যে তাদের নিঃসীম দুঃখকষ্ট আর অত্যাচারক্লিষ্ট জীবনযন্ত্রণা সম্পর্কে আত্মপ্রসাদে উদাসীন হয়ে থাকবেন, এটা নিশ্চিতভাবে খুব লজ্জার ব্যাপার।' সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। কারণ তখন থানা জেলার উম্বরগাঁও, দহানু, পালঘর আর জওহর তালুকের এক হাজার বর্গমাইল-ব্যাপী অরণ্যে হাজার হাজার ওয়ারলি আর অন্যান্য মানুষ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় অনাহারে কোনো রকমভাবে বেঁচে আছে। বছরের বেশির ভাগ সময় তাদের হয় অনাহারে নয় গাছের পাতা, গাছের শিকড় অথবা কন্দ খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। একবার একজন মানুষ বেগার খাটতে অস্বীকার করায় তাকে পায়ে বেঁধে গাছের উপর থেকে মাথাটা মাটির দিকে করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ঠিক তার নীচেই মুখের কাছে আগুন জ্বেলে তার মধ্যে লঙ্কা দিয়ে দেওয়া হল। আর সেই অবস্থায় পিঠের উপর পড়তে লাগল চাবুকের পর চাবুক।

এই মানুষদের অসহনীয় যন্ত্রণার অবসানের জন্য জেহাদ ঘোষণা করে তিরিশের দশক থেকে ব্যাপক সংগ্রামের সূচনা করেন আম্বেদকর। জীবনের প্রথম দিকে এদের পক্ষে অসাধারণ অক্লান্ত যোদ্ধা আম্বেদকর সঠিকভাবেই উচ্চবর্ণের আর কংগ্রেসের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ভূমিদাস-নির্ভরতাকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জমি আর আলাদা বাসভূমি দাবি করেছেন। সাথে-সাথে গান্ধীজীর আদিবাসী তথা হরিজন-কল্যাণ পরিকল্পনাকে 'রাজনৈতিক অনুকম্পা' বলে ঘোষণা করেছেন। সবশেষে তাঁর অনুগামীদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

এরপরও কিন্তু তারা নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এখানে ভাগ্যের একটি পরিহাসের কথা অবশ্যই আমাদের স্মরণ করতে হবে; তা হল—আম্বেদকরই ভারতের 'পবিত্রতম সংবিধান'-এর প্রধান প্রণেতাদের একজন। এই সংবিধানে অজস্র-শব্দসংবলিত অনেক কথা ব্যয়িত হয়েছে এই নির্যাতিত মানুষদের কল্যাণকামনায় আর উন্নতিকে সুনিশ্চিত করে। এবং পবিত্রতম সংবিধানকে রক্ষাকবচ করেই দিনে রাতে এই মানুষদের গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তাদের জমি আর সামান্য পর্ণকুটির থেকেও উৎখাত হতে হয়েছে। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এই আম্বেদকরই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিজেকে একজন প্রবঞ্চিত মানুষ হিসাবে দেখেছেন, লজ্জায় সংকোচে অবনত হয়েছেন।

৩

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো একজন 'সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদী' মানুষ। স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কিন্তু প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের আদিবাসী-নীতিকে মেনে নিলেন। তবে একটু উদার হয়ে তিনি সংবিধানে ১১টি ধারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসাবে সংযোজন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

(১) 'অচ্ছুত'প্রথা নির্মূল করা এবং যে কোনো ভাবে (in any form) এই অশ্রীতিকর প্রথা বন্ধ করা [ধারা ১৭]।

(২) শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নে উৎসাহ দেওয়া এবং সামাজিক অবিচার আর শোষণের থেকে রক্ষা করা [ধারা ৪৬]।

(৩) সমস্ত সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে অনুন্নত গোষ্ঠীর জন্য চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা [ধারা ১৬, ৩৩৫]।

(৪) লোকসভা আর বিধানসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্ব ২৫ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বজায় রাখা [ধারা ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪]।

(৫) বেগারপ্রথা এবং দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা [ধারা ২৩]।

এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচে "অনুন্নত সম্প্রদায়ে"র উন্নতি আশানুরূপভাবে এগোয় নি। তাই ভারত সরকার এদের জন্য "কল্যাণমূলক" কর্মসূচী আরো ভালোভাবে নেবার তাগিদে ১৯৫৫ সালে কাকা কালেলকরের সভাপতিত্বে কমিশন বসান। কে. কে. কমিশন চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ২৩৯৯টি বর্ণ-গোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত করেন। চারটি মানদণ্ড হল :

(১) হিন্দু সমাজের চিরায়ত বর্ণভিত্তিক ব্যবস্থায় যাঁরা নীচুতে আছেন।

(২) যে-সমস্ত গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

(৩) সরকারি চাকরিতে যে-সমস্ত গোষ্ঠীর অনুপাত নগণ্য বা আদৌ নেই।

(৪) ব্যাবসা-বাণিজ্য আর শিল্পে যেসব গোষ্ঠীর স্থান অতি নগণ্য।

কে কে কমিশনের সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করেন নি। কারণ, সরকারি মতে, যে চারটি মানদণ্ড-এর ভিত্তিতে কমিশন অনুন্নত গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করেন, তা যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। এরপর ১৯৭৯ সালে ভারত সরকার বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের (বি পি মণ্ডল) সভাপতিত্বে দ্বিতীয় কমিশন গঠন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটি ভারত সরকারের দপ্তরে পড়ে আছে 'still under consideration' বলে। যাই হোক, মণ্ডল কমিশন-

এর রিপোর্টে আমরা যে-সমস্ত তথ্য পাই তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল :

মণ্ডল কমিশন মূলত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ১১টি বিভাগে বিষয়টি বিবেচনা করেন। মানদণ্ড তিনটি হল :

(১) সামাজিক মানদণ্ড (মোট চারটি বিভাগ)

(২) শিক্ষাগত মানদণ্ড (মোট তিনটি বিভাগ)

(৩) অর্থনৈতিক মানদণ্ড (মোট চারটি বিভাগ)

এই বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায়, তা হল : ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ১০০ জনের মধ্যে ৫২ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রতি ১০০ জন সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ১৩ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের। সবশেষে মণ্ডল কমিশন যে মন্তব্যটি করেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—'প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অনুন্নত সম্প্রদায়-এর মানুষ জানিয়েছে যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের বাস্তব অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি।' কমিশন দেশব্যাপী এক ব্যাপক 'প্রশ্ন-উত্তর' সমীক্ষায় এই মন্তব্যটি করেন।

মণ্ডল কমিশনের মূল সুপারিশগুলির একটি ছিল :

(১) অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ২৭ শতাংশ, এবং

(২) তপশীলভুক্ত আদিবাসীদের জন্য ২২·৫ শতাংশ সব রকমের সরকারি চাকরি সংরক্ষণ,

(৩) আমূল ভূমিসংস্কার।

পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কে. কে. কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেন নি; কারণ 'তা যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ছিল না'। আর মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ১৯৮০ সালে পেশ হলেও 'still under consideration' অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কার্যত উদাসীন মনোভাব নিয়েও সংবিধানের আওতায় এবং সরকারি প্রশাসনে নিম্নবর্গের এই মানুষদের যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে, এবার তা উল্লেখ করা যাক।

(১) লোকসভার বর্তমান ৫৪২টি আসনের মধ্যে তফশীলভুক্ত মানুষদের জন্য ১১৯টি এবং বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভার মোট ৩,৯৯৭টি আসনের মধ্যে ৮৭২টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) সংবিধানের ৩৩৫ ধারা অনুসারে মোট ২২·৫% সরকারি চাকরি এবং উচ্চপদে প্রমোশন-ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

(৩) সংবিধানে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে একটি কমিশন গঠিত হয়। এবং এই একই কাজের জন্য ১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭৩ সালে সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। এখন এই সংসদীয় কমিটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে, কমিটির নিয়োগ এক বছরের মেয়াদে।

(৪) ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় এদের জন্য খরচ করেছেন যথাক্রমে প্রথম পরিকল্পনায় ৩০·০৪ (কোটি টাকায়), দ্বিতীয় ৭৯·৪১, তৃতীয় ১০০·৪০, বাৎসরিক পরিকল্পনা ৬৮·৫০, চতুর্থ ১৭২·৭০, পঞ্চম ২৯৬·১৯, ষষ্ঠ ১৩৩৭·২১। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারও পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতে (নন-প্ল্যান বাজেট) প্রচুর টাকা খরচ করেছেন।

(৫) ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ঘোষিত ২০-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী তপশীল উপজাতিদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল যেখানে ২৭৬০ লক্ষ পরিবার, সেখানে ৩৯·৬৭ লক্ষ তপশীল উপজাতি মানুষকে দারিদ্র্যসীমাকে অতিক্রম করতে সমর্থ করেছেন। এবং সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম বছরেও (১৯৮৫-৮৬) লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮, ৩৪,৫৩৭টি পরিবার; সেখানে ৮, ৭৩,১০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

সংবিধানের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় এই মানুষদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন আছে তা কতটা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের আশ্রয়ে লালিত, আর কতটা নবলব্ধ স্বাধীনতার মৌল চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত, পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

ঔপনিবেশিক আমলে পিছিয়ে-থাকা মানুষদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, সরকারি চাকরিতে আর

শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে জাতপাতের স্বাতন্ত্র্যবোধকে জিইয়ে রাখা আর প্রয়োজন হলে তাকে উশকে দেওয়া, এবং কার্যক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত না করা। মুসলিম লীগ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীর ভূমিকা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে।

ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নেহরুর বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের অনেক কথা শোনা গিয়েছিল। এমনকি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী-রূপেও বক্তৃতার পর বক্তৃতায় তিনি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার সংকল্প বারংবার উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু জীবনের অন্তিম লগ্নে ১৯৬৩ সালে লোকসভায় বিখ্যাত দারিদ্র্য-সম্পর্কিত বিতর্কে নেহরু স্বীকার করলেন দেশে শিল্পায়ন এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও ধনীরা আরো ধনী হয়েছে এবং গরিবেরা হয়েছে আরো গরিব। দেশের পশ্চাৎপদ মানুষদের জীবনযাত্রার কোনো উন্নতিই হয় নি।

ফলত দেখা যায়, স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই শ্রেণীর এক-আধজন মানুষকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভাও আগেকার ভূমিসম্পর্ক এবং উপনিবেশিক মতাদর্শের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। তাই জাতপাতব্যবস্থার বিলোপ অনেক পরের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনেকেই এই জাতপাতকে আশ্রয় করেই ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশীদার হয়ে পড়েন বা হতে চান। সুতরাং দেখা যায়, সমাজের অন্যান্য অংশের মতোই ওই এক-আধজন ক্ষমতা আর সুযোগ-সুবিধার যত কাছাকাছি যেতে পেরেছেন তাঁরা ততটাই আগ্রহী হয়ে পড়েছেন স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। এবং রাজনৈতিক ওলট-পালটে ক্ষমতাচ্যুত হলেই এই মানুষদের প্রতি নির্যাতন-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। হরিজনদের বাৎসরিক সমাবেশে সন্ত রুইদাসের ছবির পাশে অস্পৃশ্যদের পুজা পেতে জগজীবন রাম কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অথচ এই জগজীবন রামই দশকের পর দশক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার সময় স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলার ব্রত নিষ্ঠাসহকারে পালন করে গেছেন। এরকম উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে। আর শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, এই শ্রেণী থেকে যে-সমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মানুষ উপরে উঠে এসেছেন, তাঁরাও মতাদর্শগতভাবে শুধু দাবি জানিয়েছেন আরো চাকরি, আরো আসন-সংরক্ষণ, আরো শিক্ষার সুযোগ। এবং সমতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বাইরে তাঁরা মৌলিক বিষয়ে কখনও সেভাবে সোচ্চার হন নি, আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। ফলে তাঁদের কয়েকজনের উন্নতি হলেও সকলের সামাজিক অবস্থার আর বৈষম্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই দেখা যায়, সরকারি চাকরিতে এই অনগ্রসর মানুষেরা চাকরি পায় ১০০ ভাগ জমাদার-ঝাড়ুদার হিসাবে, অথচ উপরের দিককার ন্যূনতম সংরক্ষিত চাকরিগুলি তাদের জোটে না। এই কয়েকজনের উন্নতি এবং ব্যবহারগত উদাহরণ তুলে ধরে অধ্যাপক শ্রীনিবাস এক-জাতীয় 'সোশ্যাল মোবিলিটি'র ওপর নির্ভর করে তাঁর বহুখ্যাত 'স্থানস্ক্রিটাইজেশন'-এর তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, নীচুতলার এই মানুষেরা উঁচুজাতির মানুষদের সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে, তাদের আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি-অনুসারী জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই দু-চার পুরুষের মধ্যে উঁচুজাতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে, এবং উঁচুজাতি-রূপে পরিগণিত হবে। অবশ্য এ-জাতীয় ধারণার প্রথম লক্ষণগুলি প্রকাশ করেন ম্যাক্স্ হেবর। ভারতবর্ষের উদাহরণ তুলে এই ধারাকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এর ফলপ্রসূতা নিয়ে অবশ্যই সন্দেহ থেকে যায়।

এদের উপর সামাজিক শোষণ আর অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনা আমরা আগেই তুলে ধরেছি। এবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ দেখা যাক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার,

গুজরাত, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরল, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, প্রভৃতি রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যায়—

১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চাৎপদ মানুষদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে ৫৬৫৯৬টি, এতে নিহত হয়েছেন ১৮৫২ জন, ধর্ষিতা মহিলার সংখ্যা ১৯৪১ জন। বেশির ভাগ রাজ্য সরকার জানিয়েছেন যে গ্রামাঞ্চলের বিত্তশালী মানুষই এর জন্য দায়ী।

এ ধরনের ঘটনায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত বিহারে ৫৬৫৬টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু আসামিরা কেউ সাজা পায় নি। গুজরাতে ১৬২০টি মামলার মধ্যে মাত্র ২৩টি মামলায় অপরাধীরা শাস্তি পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ১৭,৪১৩টি মামলার মধ্যে মাত্র ৭২১ জন অপরাধী সাব্যস্ত হয়। মধ্যপ্রদেশে ১২,৩৫৫টি মামলার মধ্যে ৪৪৮২টি মামলার আসামি খালাস পায়, আর বেশির ভাগ মামলা মুলতুবি থাকে। এই হল সামাজিক ন্যায়বিচার।

আর কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে কোটি-কোটি টাকার হিসাব তুলে ধরেন 'আদিবাসী উন্নয়ন' প্রকল্পের নামে—তা কতটা এই মানুষদের কল্যাণে লাগে আর কতটা দেশবাসী-নামক ঠিকাদারদের পুঁজির বহর বাড়িয়ে চলে এবং আড়-কাঠিরা আত্মসাৎ করে, তা ওয়াকিবহাল মহল ভালো-ভাবেই জানেন। জানেন কেন্দ্রীয় সরকার, জানেন প্রতিটি রাজ্যসরকারও। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, বিহার সরকার আই-আর-ডি-পি খাতে ছোটোনাগপুরে যে টাকা ঢেলেছেন, তার অধিকাংশই লুঠ করেছে উত্তর বিহারের ঠিকাদারেরা। কারণ, প্রশাসন তাদের দখলে। এমন-কি স্থানীয় বিভিন্ন প্রকল্পে ঠিকাদারদের অধীনে সামান্য যে কয়েকজন এই শ্রেণীর মানুষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন, তাঁরা ন্যূনতম মজুরিটুকুও পান না। কখনও-কখনও মজুরির অর্ধেক তো দূরের কথা, সিকি ভাগ জোটাও কষ্ট-সাধ্য। পুরুলিয়ার কাছে বিহারের চাগিলে সুবর্ণরেখা প্রকল্পের যে কাজ চলছে, সেখানে গেলেই আগ্রহী যে-কেউ তথ্যটা মিলিয়ে নিতে পারবেন। আবার সত্তর দশকের গোড়ায় নতুন করে উপজাতি উন্নয়ন এজেনসির (ট্রাইবাল ডেভলাপমেনট এজেনসি) মাধ্যমে বিহার অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার আটটি জেলায় নির্দিষ্ট সময়-ও কর্মসূচী-ভিত্তিক কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্প সম্পর্কে ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারতের কমট্রোলার অ্যানড অডিটর জেনারেলের সমীক্ষায় রিপোর্টটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষা রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে—উপজাতিদের জন্য ব্যয়িত টাকার একাংশ চিহ্নিত মানুষেরা পান নি, এবং সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকার এক বড়ো অংশের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় নি। যেমন, উড়িষ্যার কেওনঝরের ৭৯৪৪০ জন সাহায্য-প্রাপ্ত উপজাতির মধ্যে ৫২৭৫ জনের কোনো অস্তিত্বই মেলে নি। বরাদ্দ টাকা সরকারি কর্মচারী আর অন্যান্যরা আত্মসাৎ করেছেন।

৪

এই অনগ্রসর মানুষের বাসস্থানের যে উল্লেখ আমরা আগেই করেছি তার অধিকাংশই ছিল তাদের নিজস্ব বাসভূমি, চাষভূমি, জীবিকাভূমি। কিন্তু পর্যায়ক্রমে আজকে তারা অধিকাংশই জমির মালিকানা থেকে উৎখাত হয়েছে সম্পন্ন দেশবাসীর দ্বারাই, এবং পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষের কায়িকশ্রমনির্ভর সুলভ শ্রমভাণ্ডারে। এই সুলভ শ্রমভাণ্ডারের একান্ত প্রয়োজন ছিল জমির মূলধন কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে, সরকারি বেসরকারি শিল্পায়নের তাগিদে। আমরা সংক্ষেপে দুটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরব। প্রথমটি কৃষিক্ষেত্রের, দ্বিতীয়টি শিল্পক্ষেত্রের।

বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যানে এবং প্রচারমাধ্যমে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, শুনতে পাই—এই

পশ্চাৎপদ মানুষদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে হাজার-হাজার একর জমি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। তাদের দেওয়া হচ্ছে চাষের সাজসরনজাম, উপরন্তু সরকারি ঋণ। এখানে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি খুবই পরিষ্কার, তবে বাস্তব চিত্রটা কেমন, তাই আমরা দেখব। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেই এদের মধ্যে বণ্টিত জমির পরিমাণ উল্লেখ করার মতো। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে ১১০টি পরিবারকে ২৫২৯ একর, বিহারে ৩১৫১টি পরিবারকে ৫৬৪৬ একর, উড়িষ্যায় ১৩৮০টি পরিবারকে ১৯৬৮৭ একর, বোমবাই প্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যে যথাক্রমে ৭২৯৮৫ ও ১০০৭৯ একর জমি দেওয়া হয়। এর সাথে রয়েছে বিনোবা ভাবের "ভূদানযজ্ঞের" মাধ্যমে বণ্টিত জমি। একমাত্র উড়িষ্যার কোরাপুট জেলাতেই ভূদানের মাধ্যমে ৫৯৮৫৫ একর জমি বণ্টিত হয়েছিল ২৮৭১টি পরিবারের মধ্যে। মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রে এইভাবে বণ্টিত জমির পরিমাণ বেশ ভালোই।

উপরের পরিসংখ্যান-চিত্রটি দেশবাসীকে অন্তত ভাবতে উৎসাহিত করে যে এবার অন্তত এদের একাংশ মানুষের মর্যাদায় দেশবাসীর একজন হয়ে উঠবে। বাস্তবে গিয়ে দেখা গেল, এই বিশাল বণ্টিত জমির প্রায় সবটাই পতিত পাথুরে অনুর্বর জমি। আমরা যে উদ্‌বৃত্ত শ্রমভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করেছিলাম—সেই শ্রমভাণ্ডারই নিয়োজিত হল যেখানে সম্ভব এই পাথুরে জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার কাজে যাতে দেশবাসীর জন্য শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। আজ বেশ গর্বের সাথেই ঘোষণা করা হয়, 'ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ম্ভর'—অবশ্য সেই খাদ্য কিনে খাবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। একবারও উচ্চারণ করা হয় না যে, ভারতবর্ষের ২০ কোটির উপর মহিলার দুবেলা পেট পুরে খাবার জোটে না, অর্ধেক ভারতবাসী অর্ধাহারে কাতরায়, আর লক্ষ-লক্ষ অনগ্রসর মানুষের অনেক-দিনই কেটে যায় অনাহারে বা আধ্‌ড়িপাতা, মহুয়া-ফুল আর কন্দ খেয়ে।

আজ, ৩৩ বছর পর অনুসন্ধান করলে সরকারি ভাবেই প্রমাণিত হয়ে যাবে সেই বণ্টিত জমি যখনই শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে তখনই হস্তান্তরিত হয়ে গেছে দেশবাসীর কাছে। এর দ্বারা আরেকটি সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল—জমি তৈরির কারিগরদের এক পতিত পাথুরে জমি থেকে আরেক পতিত পাথুরে জমিতে সহজেই ঠেলে দেওয়া গেল। ফলে ওই অসহায় অভুক্ত মানুষগুলিই জমি থেকে জমিতে স্থানান্তরিত হয়ে চলে দেশের শস্যভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তোলার জন্য। আর যেখানে তাদের হাতে জমিগুলি এখনও আছে—সেই জমিতে ফসল ফলে না, সেচের ব্যবস্থা হয় না। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সাম্প্রতিক উড়িষ্যার কোরাপুট আর কালাহাণ্ডির ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সমগ্র কোরাপুট জেলার মাত্র ১০ শতাংশ জমি সেচের আওতায় রয়েছে, এবং বিহারের ছোটো-নাগপুরে মাত্র ৭·২ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৬ শতাংশ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার-গঠিত সংস্থা ট্রাইবাল ডেভেলপমেনট এজেনসি অথবা ইনটিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলাপমেনট প্রোজেকটের মাধ্যমে এদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন আর পরিবর্তনের যে-সমস্ত সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল তার অবস্থা কেমন দাঁড়াল, তাও আমরা জেনে নিতে পারি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত বিশেষবহুমুখী উপ-জাতি ব্লক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষির সম্প্রসারণ, ভূমিসংস্কার, সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এক ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়া হয় মহারাষ্ট্রের আকরানি মহল (পশ্চিম খান্দেশ), দান্তারামপুর (পাঁচমহল), পেনটমহল (নাসিক) মধ্যপ্রদেশের দান্তেওয়াড়া ও নারায়ণপুর (বস্তার), জশপুর (রায়গড়), ভরতপুর (সুরগুজা) রাজস্থানের কুশলগড় (বাঁশোয়ারা) অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ও হুকুমপেট (বিশাখাপট্টম), মারলাভাই (আদিলবাদ) উড়িষ্যার ভুইঞাপীড় (কেওনঝর), কাশীপুর (কালা-হাণ্ডি), নারায়ণ পাটনা (কোরাপুট), বারুণ (ময়ূরভঞ্জ), বিহারের বিষ্ণুপুর (রাঁচি), সিমতেগা (রাঁচি) মহুয়াডাঁর (পালামৌ), বোরিও (সাওতাল পরগনা) মনোহরপুর (সিংভূম)-এ। আজকে দেখা যাচ্ছে, ওই-সমস্ত এলাকার মানুষের জীবনে এই প্রকল্প কোনো কল্যাণধারাই বয়ে আনে নি। উপরন্তু, পরিহাসের বিষয় হল, ব্লকগুলিসহ আশেপাশের বিশাল এলাকার জমিও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে; তারা পরিণত হয়েছে উদ্‌বৃত্ত শ্রমভাণ্ডারে। তারা নিজভূমি থেকে স্থানান্তরিত।

এবার আমরা দেশের শিল্পায়নের উদাহরণটি তুলে ধরব। প্রগতির স্বার্থে, উন্নতির স্বার্থে দেশের শিল্পায়ন আমাদের অবশ্যই কাম্য। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তাদের বসত এলাকাগুলি যখনই শিল্পায়নের প্রয়োজনে দেশের কল্যাণে অধি-গ্রহণ করা হয়েছে তখন তারা সেই স্থান থেকে উৎখাত হয়েছে, হয়েছে সহায়সম্বলহীন। কারণ, গড়ে-ওঠা কলে-কারখানায় তাদের কর্মসংস্থান হয় নি, সরকার-প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনও তারা পায় নি। সবশেষের পরিণতি: তাদের বসত এলাকায় তারা ক্রমশ হয়ে পড়ছে সংখ্যালঘু।

ছোটোনাগপুরে স্বাধীনতার সময়েও তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৬০ শতাংশের বেশি। কিন্তু যতই দিন গেল, শিল্প গড়ে উঠল, দেশ সমৃদ্ধ হল, দেশবাসীরা চাকরি পেল, ততই তারা হয়ে পড়ল সংখ্যালঘু। এখন তাদের সংখ্যা ৩৮ শতাংশে নেমে গেছে।

প্রথম পরিকল্পনায় উড়িষ্যায় তৈরি হল হিন্দুস্থান স্টীল প্রাইভেট লিমিটেড। উৎখাত হল ২৩৩৩টি পরিবার। পুনর্বাসন পেল মাত্র ১০৮টি পরিবার। তৈরি হল হীরাকুদ বাঁধ, আর উৎখাত হল ১৪৩৫২টি পরিবার। পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪৬৪৪। এবং সাম্প্রতিক প্লাইউড, কাগজ-কল, দেশলাই কারখানার জন্য যে 'বনসৃজন-নীতি' নেওয়া হয়েছে, তাও গেছে এই মানুষের বিরুদ্ধে। অরণ্যভূমিনির্ভর যে জীবিকার উৎস ছিল তাদের, এর ফলে বন্ধ হল তাও। বস্তার ছত্তিশগড় থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের সর্বত্র পাইন ইউক্যালিপটাস আকাশমণি গাছে ছেয়ে যেতে থাকে। এই গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে। তিন-চার বছরের মধ্যে কাগজকলে পাঠাতে বিশেষ অসুবিধা নেই। মহারাষ্ট্রে কর্ণাটকে চাষিদের জমিই লীজ নিয়ে এই গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে কাগজ-কলের লাভ'।[৩] এতে লাভের পরিমাণ এতই বেশি যে ভারতের এক বৃহৎ মূলধনী মফৎস্বল গ্রুপস মহারাষ্ট্রের এরকম অনেক মানুষের জমি নিয়ে নিয়েছে। ঠিক একইভাবে WIMCO, AMCO-র মতো বহুজাতিক সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গাছ লাগানো হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন, গাড়োয়াল কিংবা হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশ জুড়ে।

শিল্পায়নে দেশের দেশবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে এই নিঃস্ব মানুষদের বঞ্চনার এক উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায় ছোটোনাগপুর অঞ্চল জুড়ে। ভারতের মোট ভৌগোলিক সীমার মাত্র ২·৫ শতাংশ বিস্তৃতি নিয়ে এই ছোটোনাগপুর। কিন্তু ভারতের মোট খনিজ সম্পদের ২৫ শতাংশই পাওয়া যায় এখানে। কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র, বকসাইট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে যেমন একদিকে গড়ে উঠেছে সরকারি উদ্যোগে বড়ো-বড়ো শিল্পাঞ্চল তথা "আধুনিক ভারতের মন্দির", তেমনি বেসরকারি উদ্যোগও পিছিয়ে থাকে নি। বোকারো, রাউরকেল্লা, ভিলাই-এর ইস্পাত কারখানা, সিনঝ্রির সারকারখানা, চন্দ্রপুরার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, হীরাকুদ বাঁধ দেশবাসীকে যতটা স্বয়ম্ভর করেছে ততটাই নিঃস্ব অসহায় করেছে এই-সমস্ত অনগ্রসর মানুষদের। আজকে এই শিল্প-সমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে তাই আশ্রয় আর নিরাপত্তা পেয়েছে সারা ভারতের অগ্রসর সমৃদ্ধ দেশ দেশবাসী এবং তারই সাথে নিরাশ্রয় হয়েছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ তাদের সামান্য মাথা গুঁজবার জায়গাটুকু হারিয়ে,

দিনান্তের সামান্য আহারটুকু সংগ্রহের অরণ্যভূমি আর চাষের জমি থেকে। এরই মর্মান্তিক পরিণতিতে তাদের জীবনে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে, তারা হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। তারা কখনই দেশবাসী হয়ে ওঠে না—হয়ে থাকে ঔপনিবেশিক আদর্শে আর বর্তমান স্বাধীনপ্রশাসনকথিত ভাষ্যেও আদিবাসী।

৫

উপসংহারের বদলে কয়েকটি কথা :

(ক) শিক্ষায় মননে বৈভবে যে দেশবাসীরা অগ্রবর্তী তারা কি কখনো সচেতনভাবে ঘৃণা আর অবজ্ঞার দৃষ্টি সরিয়ে 'আদিবাসী' বা 'হরিজন' বা বা 'অচ্ছুত' তথা গোটা পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে 'মানুষ' হিসাবে আদৌ দেখেছেন, না দেখতে চেয়েছেন? এমন কি রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল বলে যাঁরা দাবি করেন—তাঁরাও। আমাদের সমাজসংস্কারকরা এই মানুষদের সমস্যাগুলি দেখেছেন নিছক জাত-পাত-অস্পৃশ্যতাগত বিভেদ হিসাবে—যা উৎপাদনসম্পর্কের সাথে সম্পর্কশূন্য কিছু অন্যান্য বিষয় মাত্র। এমনকি রাজনৈতিক নেতাদেরও ধারণা হল কুসংস্কারের নিন্দা করলে, আর যারা এসবের প্রশ্রয় দেয় তাদের এসব বর্জন করতে বললেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমন কি গান্ধীজীও এর বাইরে দৃষ্টিপাত করতে পারেন নি। আমূল ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গ এড়িয়ে নিছক সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন করে এ -সমস্যার সমাধান সম্ভব কি?

(খ) কংগ্রেস এবং গান্ধী বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বাধীনতা আর ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতা গান্ধী নন, কংগ্রেস পেয়েছিল। কিন্তু গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াল : জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, আর দেশী মন্ত্রী। স্বাধীনতার অর্থ যে এর বাইরে অন্য কিছু হতে পারে, তার আভাসও দেওয়া হল না। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর কালে খুব দ্রুত সবারই প্রতিপক্ষ হয়ে গেল ভারতীয়। অন্য বর্গের, অন্য গোষ্ঠীর ভারতীয়। ফলে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও দেখা গেল, নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য অসংখ্য আইনকানুন কমিশন হলেও তাদের প্রতি সামাজিক নির্যাতন আর নৃশংসতার ঐতিহ্য বহমান।

এবং এই মানুষেরা যখন নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে, তখনই গ্রামীণ কায়েমি স্বার্থ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের জীবনকে রক্তাক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র কায়েমি স্বার্থের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং তাদের যে-কোনো ধরনের আত্মরক্ষার চেষ্টাকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আর উগ্রপন্থীদের উশকানি বলেছে।

(গ) পুরনো আমলের 'ব্রাউন সাহেব'দের অর্থাৎ কংগ্রেসিদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে শাসনযন্ত্রের উপরের স্থানগুলিতে দখল নিশ্চিত হল। সাদা সাহেবদের জায়গায় ব্রাউন সাহেবদের রাজত্ব কায়েম হল। এঁরা কেউই কোনো অর্থেই নিম্নবর্গের প্রতিনিধি ছিলেন না; কিন্তু তাঁদের একটা সর্বভারতীয় পরিচিতি ছিল। যেমন গান্ধী নেহরু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজাদ রাজাগোপালাচারী। অন্তত ভাষা আর আঞ্চলিকতার প্রশ্নে এঁদের আক্রান্ত হতে হয় নি। পরবর্তী ইতিহাস কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। বিশেষ করে দীর্ঘ এক দশকের উপর সর্বস্তরে কংগ্রেসের মনোনয়নপর্বের রাজনীতি আঞ্চলিকতা আর জাত-পাতের প্রশ্নকে আরো বেশি করে সক্রিয় করে তুলেছে এবং প্রয়োজনমাফিক ইন্ধন জুগিয়েছে। যেমন পানজাবে আসামে ত্রিপুরায় বিহারে পশ্চিমবঙ্গে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিভাজনের উপর দাঁড়িয়েও ঔপনিবেশিক পর্বে স্বাধীনতাকেন্দ্রিক যে অসম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল তারই পাশাপাশি নানা ধরনের ক্ষুদ্র, কোথাও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও গড়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা দিয়ে এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তখনকার মতো ঝিমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলেও—এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না।

(ঘ) শতাংশে জনসংখ্যার সামান্য হলেও নব-শিক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষ বুঝতে পারছেন স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও তাঁদের বাস্তব অবস্থাটা কেমন। এবং এই বাস্তবতা বুঝবার জন্য মিশনারি বা বিদেশী ইন্ধনের প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতার পরবর্তী প্রতিটি স্তরেই দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে আরো বেশি করে। তা রাজনৈতিক প্রশাসনিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দলীয় সংগঠন—যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন। এ ছাড়া নিম্নবর্গের এই মানুষদের যে-কোনো সমস্যাকে, তাদের সংস্কৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখার ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অতি-কেন্দ্রিকতা আরও বাড়ছে। ফলে নিম্নবর্গের যে-কোনো আন্দোলনকেই জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক তথা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা সহজ হচ্ছে। এমনকি বিদেশী চক্রের পদধ্বনিও অনেক সহজেই শোনা যাচ্ছে। মূল সমস্যা হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষেরা এখন আর দেশের নীরব নাগরিক না থেকে সরব দেশবাসী হতে চাইছে। চাইছে তাদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে, প্রয়োজনে যুঝে নিতে।

(ঙ) দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষে সমতার আদর্শে সমাজতন্ত্রের-আওয়াজ-তোলা বিভিন্ন দল উপদল নানাভাবেই সমাজের অগ্রসর মানুষদের সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন আর ভেবেছেন, সমস্ত নিপীড়িত মানুষেরা তাঁদের আওয়াজ শুনেই স্বেচ্ছায় দলের পতাকাতলে শামিল হবে। এমনকি বিভিন্ন পর্যায়ে বামপন্থী দলগুলিও, উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে, সমগোত্রীয় ভাবের রাজ্যে বিরাজ করেছেন। ফলত, ভারতবর্ষের বিস্তৃত অংশের এই মানুষেরা কখনো আম্বেদকর, কখনো গান্ধী, কখনো জগজীবন রাম, কখনো কাঁশীরাম-এর নেতৃত্বে আশ্রয় পায়; কিন্তু পায় না মুক্তির পথ।

(চ) ঔপনিবেশিক শাসনে ১৮৭৪ সালে বাঙলা থেকে আসাম আলাদা হল। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর্বে বিহার আর ওড়িষ্যা বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল। ১৯৩৬ সালে বিহার থেকে ওড়িষ্যা হল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ১৯৫৩ সালে রামালুর নেতৃত্বে মাদ্রাজ প্রেসিডেনসি থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি হল। ১৯৬০ সালে বোমবাইকে ভেঙে মহারাষ্ট্র আর গুজরাতের জন্ম হল। ১৯৬৬ সালে হল পানজাব আর হরিয়ানা। বিভিন্ন পর্বে আসামকে ভেঙে তৈরি হল আলাদা রাজ্য—মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যানড, অরুণাচল প্রদেশ। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ একবারও বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা তুললেন না। এমনকি ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাথে কংগ্রেস গাঁটছড়া বাঁধল তারাই এখন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আওয়াজ তুলেছে। নতুন রাজ্য তৈরি হলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না, তার প্রমাণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে কোনো রাজ্যের বর্তমান অবস্থা। পানজাব আর হরিয়ানার মধ্যে বিভিন্ন বিরোধও একথাই প্রমাণ করে। বা মহারাষ্ট্রের সাথে ভাষা প্রশ্নে গোয়া আর কর্ণাটকের বিরোধ তুলে ধরা যেতে পারে। তাই আলাদা রাজ্য মানেই সব সমস্যার সমাধান নয়। আসলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় প্রশাসন সামাজিক-অর্থ-নৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধিপত্যকারী গোষ্ঠী-গুলির কাছে মাথা নত করে বারংবার পৃথক রাজ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য অবদমিত নিম্নবর্গের কথা আলাদা।

(ছ) সুতরাং ক্ষমতা আর মূলধনের কেন্দ্রীভবন ঘটছে যেমন একদিকে, তার বিপরীতে কেন্দ্রীভবন ঘটছে দারিদ্র্য আর অবিচারের। গত ৪০ বছরের এটাই হচ্ছে দ্রুত-বিকশিত শ্রেণী-বাস্তবতা। তাই

দেখা যায়, দেশে সম্পন্ন মুষ্টিমেয় দেশবাসীর পাশাপাশি দরিদ্রতম অসংখ্য নিঃস্ব পশ্চাৎপদ মানুষ। কিন্তু ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আর অবিচার যে শ্রেণী-চেতনার বিকাশ ঘটায় না ভারতবর্ষের আজকের সমস্যা সেই সত্যকেই তুলে ধরছে। শ্রেণীচেতনার বিকাশের জন্য দরকার নিরন্তর সংগ্রাম আর সচেতন প্রয়াস। সর্বোপরি নিজস্ব শ্রেণীসচেতন সংগঠন।

তথ্যসূত্র

১. Dr. Verrier Elwin, Presidential Address, Section of Anthropology and Archaeology, Indian Science Congress, 1944.

২. এম. কে. গান্ধী, 'ইয়ং ইনডিয়া', অকটোবর, ১৯২১.

৩. আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থা, ১ম খণ্ড, পশুপতিপ্রসাদ মহাতো, ১৯৮৪.

৪. Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (K. K. Commission).

৫. Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (B. P. Mondal Commission).

৬. India : A Reference Annual (different years) Publication Division, Govt. of India.

৭. Census of India (different years).

'জগৎ পরাধীন, কিন্তু মন স্বাধীন'

শান্তনু কায়সার

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "রত্নবতী" (লেখকের বর্ণনায় 'কৌতুকাবহ উপন্যাস', প্রকাশকাল ২রা সেপটেম্বর, ১৮৬৯)-র 'বিজ্ঞাপন'-এ মীর মশাররফ হোসেন জানিয়েছেন, 'একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি, ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন, যতদূর পারিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই।' এখানে মীরের লেখক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রেক্ষাপট, সাহিত্যভাবনা এবং ভাষাবিষয়ক চিন্তার ইঙ্গিত লাভ করা যায়। এ গ্রন্থ প্রকাশের সময় তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথামত বঙ্কিমচন্দ্রের 'নিজের লেখনীর প্রতি তখন(ও) তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই।'[১] মীরের সমসাময়িক বা তাঁর পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্যলেখকের সংখ্যা অঙ্গুলি-সংখ্যকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর "উচিৎ শ্রবণ" "রত্নবতী"র পূর্বে ১৮৬০-এ প্রকাশিত হলেও সেটি ছিল গদ্য আর পদ্যে, মিশ্র রীতিতে রচিত এবং লেখক তাতে মীর মশাররফ হোসেন যে অর্থে বলেছেন সে অর্থে কোনো গল্পও 'কল্পনা' করেন নি। এ ছাড়া গোলাম হোসেন, শেখ আজিমুদ্দিন, মুন্সী নামদার, সুজাত আলী বা আয়েন আলী সিকদার যেসব নকশা, প্রহসন, প্রণয়-কাব্য বা 'গদ্য-আখ্যায়িকা' রচনা করেছেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা "রত্নবতী"র মাত্রা- ও চরিত্র-গত পার্থক্য যথেষ্ট গভীর। আসলে মীরের ওই 'বিজ্ঞাপনে'র লক্ষ্য ছিল তৎকালীন প্রচলিত সাহিত্যরীতিকে কটাক্ষ করে এর বিপরীতে এক স্বদেশী ধারা গড়ে তোলা। সাহিত্যিক গদ্যের ওই সূচনাপর্বে বাঙলা ভাষার লেখকরা প্রধানত দুটি রীতি আর ধারার অনুসরণ করেছেন। তাঁরা হয় ইংরেজি নয় সংস্কৃতের কাছে হাত পেতে অনুবাদ,

ভাবানুবাদ বা ছায়ানুসরণ করে সাহিত্যচর্চা করেন। বিদ্যাসাগর আর মধুসূদনের উদাহরণ থেকেই বিষয়টি বোঝা যায়। গদ্যে এই বিষয়টি ছিল আরো প্রত্যক্ষ আর প্রকট। এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় দেশী উপাদান এবং উপকরণের ওপর নির্ভর, বাঙলা ভাষার শক্তি আর সামর্থ্যে আস্থা জ্ঞাপন করে এবং শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা- আর উদ্ভাবন-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মীর মশারফ হোসেন এক দেশজ গদ্যরীতি গড়ে তুলতে, এবং সাহিত্যভাবনায় উজ্জীবিত হতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতাংশের শব্দ ও শব্দ-বন্ধত্রয় 'কল্পনা', 'ভাষা-সঙ্গতি' ও 'গল্পের বন্ধন' এর সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য। "রত্নবতী" প্রকাশের দীর্ঘকাল পরে প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলী "লুপ্তরত্নোদ্ধার"-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা লিখেছিলেন তাই মনে হয় ছিল মীরের অন্বিষ্ট : 'সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না···যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের ঘরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।' মীরের নিজের লেখাতেই তার সমর্থন মেলে। "গাজী মিঁয়ার বস্তানী"র উনবিংশ নথিতে মীরের রচনার নিন্দা করতে গিয়ে দাগাদারী যা বলে তা থেকে এর প্রমাণ পাই : 'দাগাদারী বেগম ঠাকুরাণীর অন্দরমহলে চেয়ারে বসিয়া 'মনের কথা' পড়িতেছেন, এ পাতা সে পাতা উল্টাইয়া কত নিন্দা করিতেছেন। লেখকের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কেহই তাহার মত লেখক নহে। রবিবাবু-নবীনবাবু, বঙ্গবাসীর লেখা একঘেঁয়ে সেই কলকেতাই কেতা, খাঁটি বাঙ্গালা নহে। বিদ্যাসাগরের নিজের জিনিস কিছু নাই, সকলি পরের, ছেঁটে কেটে বিদ্যাসাগর ছাপ দিয়ে বাজারে বদলাই কচ্ছেন।'

"রত্নবতী" সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্য 'রত্নবতী প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা। তার ধর্ম উপন্যাসের চেয়ে রূপকথার অনেক কাছাকাছি'[২] সত্ত্বেও কিংবা এতে বাঙলাদেশের পটভূমি ব্যবহৃত না হলেও এর ভাষাব্যবহার, মিশ্র রচনারীতির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত আধুনিক দৃষ্টি আর ভঙ্গিতে কাহিনীবর্ণনা এবং চিত্রণের সুযোগগ্রহণ থেকে তাঁর ভাষা আর রচনাপদ্ধতি বিষয়ক প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এর স্বরূপ বোঝা সম্ভব হবে যদি আমরা লক্ষ করি যে, মীরের প্রথম উপন্যাস "রত্নবতী", প্রথম কবিতাসংকলন "গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু", প্রথম নাটক "বসন্তকুমারী নাটক" ও প্রথম প্রহসন "এর উপায় কি ?" হিন্দু পটভূমি এবং হিন্দু চরিত্র দ্বারা সজ্জিত। "গোরাই ব্রীজ"-এ বিলেতি সাহেবদের উপস্থিতি সত্ত্বেও দেশী 'বাবু' ও 'বিবি'দের ভূমিকাও উল্লেখ্য। "বসন্তকুমারী"-র প্রস্তাবনা অংশে নাটক বাছাই করতে গিয়ে নট ও নটী বলে :

নট।—(কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হলো শুনেছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী।—বসন্তকুমারী !!! কার রচিত ?

নট।—কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন রচিত।

নটী।—ছি ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।

নট।—কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো ?

নটী।—তা নয়, এই সভায় কি সে নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজার হোক মুসলমান !!

নটী আরো বলে, 'বসন্তকুমারী নাটকের অভিনয় কোরে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গল্পনার ভাগী হবেন। সভাস্থ মহোদয়গণের চিত্তরঞ্জন করা দূরে যাক বরং তাদের বিরক্তিই হবে।' সেই সঙ্গে "রত্নবতী"র 'বিজ্ঞাপনে' 'গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম', "বসন্তকুমারী" প্রসঙ্গে 'আমার অনুরাগ তরুর' 'বহুযত্নপ্রসূত কুসুম-কলিকা' বা 'এর উপায় কি'র 'প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি

কীটের উদরস্থ হওয়ায় ২য় বার প্রকাশে বাধ্য হইলাম'—লেখকের এইসব মন্তব্য যদি মিলিয়ে পড়ি তাহলে মনে হতে পারে যে, সাহিত্যে সহজ প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জনের জন্যেই সম্ভবত তিনি ওই হিন্দু পটভূমি এবং চরিত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি আরো গভীর অনুসন্ধান আর মনোযোগ দাবি করে।

"বসন্তকুমারী"র পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির যেখানে নটী বলছে 'হাজার হোক মুসলমান' সেখানে তার পরেই যখন নট বলে 'অমন কথা মুখেও আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে' তখন ওই অনুমান মিথ্যে প্রমাণিত হয় এবং এতে বোঝা যায়, বঙ্গদেশে অধিকতর অগ্রসর একটি সম্প্রদায়ের উন্নাসিক মনোভাবের উলটো পিঠে অনগ্রসর সম্প্রদায়েরও যে ন্যূনতম ক্ষমতা, অবস্থান আর বক্তব্য আছে, তার প্রতি লেখক সুধী পাঠক এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কিন্তু সূচনাপর্বের রচনায় হিন্দু পটভূমি আর চরিত্র বেছে নেওয়ার কারণ এটি নয়।

মীর মশাররফ হোসেন "আমার জীবনী"তে জানিয়েছেন বালক বয়সে তিনি পুঁথির বড়ো ভক্ত ছিলেন, যদিও 'পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।' "বিষাদ-সিন্ধু"র কাহিনী-সারও তিনি প্রধানত মুহম্মদ খান, হেয়াত মামুদ, শাহ গরীবুল্লাহ প্রভৃতির পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছেন। জীবনের অন্তিম পর্বে মীর মুসলিম সমাজে বহুলপঠিত পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা আর বিষয়কে পরিশোধন করে স্ব-সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাহিত্যবোধ আর রুচিকে উন্নত করতে চেয়েছেন। পুঁথিসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর এই ব্যাপক পরিচয় মীরকে এক ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে বাঙলায় পুঁথি-রচনা সম্পর্কে সৈয়দ সুলতান যে কৈফিয়ত দিচ্ছেন তা এই :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
যেসব আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চাল রচিলুঁ কার আছে ত দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিলু হিন্দুয়ানি করি।
মোহের মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

উনবিংশ শতাব্দীতেও ধর্মচর্চার বিষয়টি যান্ত্রিক ছিল। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে "আমার জীবনী"-তে মীর লিখেছেন, 'এক বৎসরের মধ্যে কোরাণ শরিফের প্রথম পারার (অধ্যায়ের)[৩] তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরা পাঠ শেষ করিলাম। অক্ষর পরিচয় বানান করিয়া পাঠ করিতে পারিলেই কোরাণ পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থজ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে ?'

এ অবস্থায় পুঁথিকাররা দ্বিধান্বিত চিত্তে 'পাপে'র ভয় সত্ত্বেও 'দেষীভাষে' কাব্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। ১৬৩৯-এ মুতালিব লিখেছেন :

মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

এ কারণে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুজ্জাজিল 'হিন্দুয়ান অক্ষরে' 'বঙ্গদেশীগণে'র বোধগম্য ভাষায় কাব্যরচনায় উৎসাহিত বোধ করেছেন। একই কারণে সৈয়দ সুলতানও 'হিন্দুয়ানি অক্ষর' হেলা না করবার ও 'দেষী ভাষা দেখি না করিও ঘীণ'-এর পরামর্শ দিয়েছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে স্বচ্ছ, স্পষ্ট আর সংস্কারমুক্ত মন এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিমের রচনায় :

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ।
যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী

সেসব কাহার জম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

ভাষাব্যবহারে মীর মশাররফ হোসেন এই ইতিবাচক ধারাটিরই অনুসরণ করতে চেয়েছেন। জীবনের অন্তিম পর্বে মীর যখন কিছুটা সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যখন অবক্ষয়িত অবস্থায় পৌঁচেছে, যখন তিনি 'ধর্ম' ও 'আদব তমিজ সংশ্রবী' ভাষারীতির অনুসরণে উৎসাহী আর উদ্‌যোগী (যে ভাষারীতিকে 'কোন কোন নব্যলিখক প্রিয় ভ্রাতা'র জবানিতে 'ডাল-খিচুড়ি' বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন), তখনও তিনি 'বিবি খোদেজার বিবাহ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, এই ভাষারীতি 'নব্য দলে আদরণীয় হইবে না—লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস।' এই ভূমিকাতেই মীর তিন শ্রেণীর পাঠকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুই শ্রেণী 'মুসলমানি বাঙ্গলা'র অনুরক্ত এবং 'ওই দুই শ্রেণীর পাঠকগণের বিশ্বাস যে পদ্যে লিখিত না হইলে—কিতাব কি প্রকারে হয়?' তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'ইহাদের রুচি পরিমার্জিত, সাধু ভাষার দিকেই অধিক টান। এই শ্রেণীর মধ্যে ভাল লিখক বর্তমান। সহজেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে সিদ্ধহস্ত! যথা—রেয়াজউদ্দীন, আবদুর রহিম, মোজাম্মাল হক, আবদুল হামিদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন এবং নওশের আলী প্রিয় ভ্রাতাগণ। ইঁহারা আবর্জনা ছাড়াইয়া মুসলমান সমাজে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রচলনে বিশেষ যত্নবান।' লেখক যদিও এরপর উল্লেখ করেছেন 'সমাজের চৌদ্দ আনা লোককে ফেলিয়া দুই আনা লোক লইয়া সাহিত্য-সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন করুন। কিন্তু দুই চারজন লিখক চৌদ্দআনা দলের সহিত মিশিয়া ক্রমশ দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হইলে কি ভাল হয় না?' তবু তিনি নিজেই প্রমাণ করেছেন যে ওই 'দুই আনা'র গদ্যরীতিই বাঙালি মুসলমানেরও অনুসৃত হওয়া উচিত। এটি একটি বাস্তব পন্থা। "আমার জীবনী"র 'মাননীয় পাঠকগণ সমীপে' তিনি যা বলেছেন তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, 'আমার জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে কথা মোসলমান সমাজে সর্বসাধারণ-মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার অবিকল বাংলা আমি জানি না। ভাবার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতিকঠোরতায় কেহ শুনিতেই ইচ্ছা করেন না। সেই সকল শব্দ যেমন প্রচলিত আছে সেই রূপই প্রকাশ করিব।' "আমার জীবনী"র পূর্বে ও পরে তিনি বেশ কিছু ধর্মাশ্রয়ী রচনা প্রকাশ করলেও তাঁর মূল সাহিত্যরীতি আর চিন্তায় তার প্রভাব হয় খুবই সামান্য, অথবা একেবারেই নেই। যেজন্যে আমরা দেখি, ওইসব রচনায় তিনি ভিন্ন ভাষাভঙ্গি অনুসরণ করলেও তাঁর সর্বশেষ রচনা, সাহিত্যিক গুরুত্ব আর তাৎপর্যে যা মীরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, তাতে অর্থাৎ "বিবি কুলসুম"-এ তিনি আবার 'সরল' 'পরিমার্জিত', 'সাধু' ও স্বাদু বাঙলাতেই ফিরে এসেছেন। আসলে মীর চৌদ্দ আনা জনসংখ্যার সঙ্গে যে যোগাযোগ-হীনতার কথা বলেছেন, তার কারণকে তাঁর কাছে সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক মনে হলেও মূলত সমাজ এবং তার অর্থনীতি ও রাজনীতিই এর জন্যে দায়ী।

এখন দেখা যাক, আত্মজীবনলালিত এবং অনুসৃত মীরের এই সাহিত্যরীতি আর চিন্তা সূচনাপর্বে কিভাবে গড়ে উঠেছিল। যে মুন্সীসাহেব মীরকে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন তিনি 'হাতে খড়ি দিলে' দারগাগিরী চাকরি না হইয়া যায় না' প্রবাদ থাকলেও 'বাংলার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল তাহারা জমা খরচ, বাকীজায়, দাখিলালিখা, চিঠি পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাঁহার নাম জাঁকিয়া উঠিত।' অতএব মীরকে তাঁর বাঙলা লেখাপড়ার শুরুতেই নন্দী মহাশয়ের কাছে যেতে হয়, যিনি

পড়াতেন :

জয় জয় দেবী, চর চর সার
কুচ যুগে শোভে মুক্তার হার
বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্মল বরণ,
রত্নবিভূষিত কুণ্ডল করণ।

"আমার জীবনী"-তেই মীর তাঁর তারুণ্যের এই চিত্র অঙ্কন করেছেন, 'কলেজে ভর্তি হইলাম। কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে। কৃষ্ণনগরের চাল-চলন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। দশজনের আচার-ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। কৃষ্ণনগরে মুসলমানের গৌরবমাত্র নাই। হিন্দুপ্রধান দেশ। ধুতি পরিতে শিখিলাম। চাদর বা উড়ানী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাশনেবল করিলাম। হায় হায়! বাউরী চুল কাটিয়া থাক থাক করিলাম। পিছনের দিকে কিছুই নাই। সম্মুখভাগে সিতীকাটার উপযুক্ত মত থাকিল। পাজামা চাপকান বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। টুপিটাও ক'দিন পর সহপাঠিরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল।··· পরণ-পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী। চালচলন হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী। মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী, যথা—শামসদ্দীন—সতীশ, নাজমল হক—নজু, বোরহান—বীরু।' "আমার জীবনী" লেখার সময় থেকে ৬০ বছর পিছিয়ে মীরের জন্মসময়ের (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর) বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যদিও 'খাঁটি মুসলমান গৃহে' ভিন্ন ধর্মের লৌকিক আচার-আচরণের নিন্দা করেছেন, তবু ওই বর্ণনা থেকেই মনে হয়, তা প্রবহমান জীবনেরই অনিবার্য অংশ ছিল। তাঁর নিজের জন্মের 'পরক্ষণেই সাতবার আজান' ও 'দিবারাত্রি কোরাণ শরীফ' যেমন পাঠ হয়েছিল তেমনি নানা লৌকিক রীতি-পদ্ধতিও পালিত হয়েছিল। 'জাতঘরে সমস্ত রাত্রি যে প্রদীপ জ্বলিবে সে প্রদীপের রশ্মিকণা বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পারে। এ সকল আয়োজন কেবল পেঁচাপেঁচির ভয়ে।···পাঁচ দিন গত হইল ষষ্ঠির রাত্র।···ছয় কুলার রাত্র কহে।···সেই রাত্রে ঘর-দ্বার বন্দ হওয়ার পূর্বে—ভাল কলম, দোত, কালি, সাদা কাগজ, একখানা কলমকাটা ছুরি, এই কয়েকটা জিনিস অগ্রে যত্নপূর্বক এক পাত্রে করিয়া অন্য কোন স্থানে রাখা হয়। তাহার পর (সরস্বতীর বিদ্যার) ঢোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠি শুড়কী তরবার ইত্যাদি শিশুর শিয়রে রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিদ্যায় শিশু পারদর্শিতা লাভ করিবে—ইহাই আশা।'

প্রবহমান এই লৌকিক সংস্কৃতির প্রতি অন্তত দুটি ঘটনায় মীরের সমর্থন ব্যক্ত এবং প্রমাণিত হয়। "বিবি কুলসুম"-এ তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে মীর জানিয়েছেন, বাল্যাবস্থায় কুলসুমের ডাক-নাম ছিল কালী। কুলসুমের মায়ের নাম ছিল লালন। একেও মুসলিমপরিচয়জ্ঞাপক নাম বলা চলে না। বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নদীয়া জেলায় (তখন কুষ্টিয়া ছিল ওই জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা) যে অনেক মুসলমানেরই হিন্দুনাম রাখা হত, সে বিষয়ে মীর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন মথদুমকে মদন বলে সম্বোধন করা হত। মুসলমান বালকের নন্দ, গৌর, কালাচাঁদ, হরে, লক্ষ্মণ ইত্যাদি নামও প্রচলিত ছিল। মীর নিজেই তাঁর সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করেন। তাঁর কন্যা রওশন, আবার ডাকনাম ছিল সতী। পুত্র ইব্রাহীম হোসেন হয় সত্যবান, আমিনা খাতুন—কুকি, যমজ বোন ছালেহা ও সালেমা হয় যথাক্রমে সুনীতি ও সুমতী, আশরাফ হোসেন—রণজিত, ওমর দরাজ সুধদা ও মীর মাহবুব হোসেন হয় ধর্মরাজ।

এসব ঘটনা আর তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়, মীর যে লৌকিক এবং সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের জীবনে লাভ করেন, সাহিত্যেও ওই স্বাভাবিক ধারাকেই অনুসরণ করতে চেয়েছেন

সাধু আর স্বাদু গদ্যের মধ্যেই তিনি তাকে আবিষ্কার করেন, এবং সে গদ্যই তাঁর প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। যে ভাষারীতি তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছেন মুসলমান জীবন আর চরিত্রকে তার প্রারম্ভিক চর্চার বাহন হিসেবে তিনি হয়তো উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। ভাষা আর বিষয়ের যথার্থ সমীকরণ এবং পারস্পরিক হজমের জন্যে তিনি এমন বিষয় নির্বাচন করতে চেয়েছেন যা তাঁর পরিকল্পিত ভাষারীতিতে খুব সহজেই মানিয়ে আর খাপ খেয়ে যাবে। সেজন্যেই সতর্ক শিল্পীর মতো তিনি তাঁর সূচনাপর্বের রচনায় 'হিন্দু' পটভূমি আর চরিত্র নির্বাচন করেছেন।

লেখক যে সচেতনভাবেই এই পদ্ধতিকে তাঁর সাহিত্যের ভাষারীতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় "আমার জীবনী"তে প্রতিপক্ষকে আহ্বান করে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য থেকে: 'চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ। আমাদের মহামাননীয় বৃটিশ রাজ সরকারী গেজেটে ১৯০০ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বস্তানী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন?......ভুশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন।...তারপর ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের প্রদীপে...।' সরকারি গেজেটে লেখকের বর্ণনারীতির প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: The writer though a Muhammedan writes Bengali with ease and possesses a wonderful command over the vocabulary of the language। আর 'প্রদীপ' লিখেছেন, 'মুসলমান সাহিত্যসেবকের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গালা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত।...এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনী বিন্যাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত কেবল 'বিষাদ-সিন্ধু'র রচয়িতাতেই লক্ষিত হইয়াছে।' সেকারণেই তাঁর সূচনাপর্বের অন্যতম রচনা, 'বিষয় ভাল নয় বলিয়া' মীর যা 'জনসমাজে প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন' সেই "গোরাই ব্রীজ" সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, 'গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।' এই সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আরো লিখেছেন, 'যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য [হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য] জন্মিবে না।'

প্রারম্ভিক পর্বে মীর হিন্দু বিষয় এবং পটভূমিতে বাঙলা ভাষার কাঠামোয় গড়ে ওঠা যে স্বাভাবিক গদ্যে সাহিত্য রচনা করেছেন, পরবর্তী কালেও বৃহত্তর এবং গভীরতর সাহিত্যচর্চায় ওই ভাষারীতির অনুসরণই শুধু করেন নি, তার উন্নয়ন আর বিকাশও ঘটিয়েছেন। একারণে "জমীদার দর্পণে" চিত্রিত দাহ্য বিষয়ের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" (ভাদ্র, ১২৮০) ওই সময় 'এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ' করার পরামর্শ দিলেও তাঁর ভাষারীতির প্রশংসা করতে ভোলেন নি: 'জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।' এই মন্তব্যে কটাক্ষ এবং উন্নাসিকতা থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে খুবই খাঁটি কথা বলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ওই সময়ে একজন মুসলমান লেখকের পক্ষে "পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা" রীতি অনুসরণ যে খুব সহজসাধ্য ছিল না, স্বয়ং মীরের রচনাই তার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য। "বিষাদ-সিন্ধু"-র উদ্ধারপর্বের চতুর্থ প্রবাহের শুরুতে লেখক নিজেই তাঁর জবানিতে সমস্যাটি ব্যক্ত করেছেন, 'কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবি-কল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনি কঠিন বন্ধন, এমনি দৃঢ় শাসন যে কল্পনাকুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান্! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কার তিমির সদ্‌জ্ঞান-জ্যোতিপ্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্যন্ত যাইতে মনের গতি রোধ তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়; কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন না। এই সামান্য আভাসেই যথেষ্ট, আর বেশীদূর যাইব না। বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে; মহাপাপের কার্যই করিয়াছি! আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন। কারণ মর্তলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে।'

"রত্নবতী"-তে বিষয়, পটভূমি আর চরিত্রদের কারণে তাতে তৎসম বা তৎসমজাত শব্দের ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক এবং একই কারণে তার ভাষাভঙ্গিটিও হয়ে ওঠে দৃঢ় এবং ঋজু। এই 'উপন্যাসে' অতএব 'প্রক্ষালন', 'কদাচ', 'অবলোকন' ইত্যাদি শব্দ কিংবা 'তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়াম্বুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে'—এরকম বাক্যের খুব সহজেই সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু এই রীতি মীর শুধু সূচনাপর্বের সাহিত্যকর্মেই অনুসরণ করেন নি, এটি তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যচর্চারও নিয়ামক হয়ে ওঠে। "রত্নময়ী"র 'কিঙ্কর' যখন 'বিষাদ-সিন্ধু'-তে 'কিঙ্কর' বা 'কিঙ্করী'তে পরিবর্তিত হয় তখন তা শুধু কাকতালীয় সাদৃশ্যকেই তুলে ধরে না, বরং রচনারীতির ঐক্য, ধারাবাহিকতা এবং তার বিকাশকেই চিহ্নিত করে। "রত্নবতী" ও "বিষাদ-সিন্ধু" রীতি এবং বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত রচনা। তবু মীরের মৌল শিল্পলক্ষ্যে তারা পারস্পরিক ঐক্যে ঋদ্ধ। "রত্নবতী"র 'দিনপতি'র ভাষারীতিই "বিষাদসিন্ধু"তে 'দিনমণি', 'উপদেবী', 'নিশাদেবী', 'নিদ্রাদেবী', 'সূর্যদেব', রবিদেব' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দ-বন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। 'আল্লাহ' বা 'খোদা'-র পরিবর্তে "বিষাদ-সিন্ধু"-তে ভগবান, ঈশ্বর, জগদীশ ইত্যাদি শব্দেরই প্রাচুর্য। এখানে 'আল্লাহ আকবর', 'বেসমিল্লাহ', 'জেন্নাত', 'বেহেস্ত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাঙলা ভাষায় যেসব শব্দ আর বাক্যরীতি সাধারণত অনুসৃত, সেসবের অনুসরণ করা হয়েছে। 'কমল অক্ষিতে বজ্র দৃষ্টি' (উদ্ধারপর্ব, একবিংশ প্রবাহ) বা 'কাসেম, গাত্রোত্থান কর......ঐ দেখ, তোমার প্রিয় অশ্ব ক্ষতবিক্ষত শরীরে, শোণিতাক্ত কলেবরে তোমাকে ধরাশায়ী দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বর্ষণ করিতেছে!...সম্মুখস্থ পদদ্বারা মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে' (মহরমপর্ব, পঞ্চবিংশ প্রবাহ)-র বাক্যরীতি আর শব্দব্যবহার লক্ষ করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত হাসানের হজরতের রওজায় গিয়ে তাঁর 'শ্রীপাদপদ্মে' আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ্য (মহরমপর্ব, পঞ্চদশ প্রবাহ)। এখানে উদ্ধারপর্বের প্রথম প্রবাহে মারওয়া-কর্তৃক সখিনার মৃতদেহদর্শনের বর্ণনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে: 'কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিল, সখিনা দেবী স্বামী-পদ দু'খানি বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া মহাপ্রাণ যেন ঈশ্বরে ঢালিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পতি-দেহ-বিনির্গত পবিত্র শোণিতে পবিত্র দেহ রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মৃতদেহে চন্দন আতর ও কর্পূরের ব্যবস্থা আছে। সখিনার অশ্রু রক্ত-চন্দনে চর্চিত হইয়া জীবন্তভাবে যেন দয়াময়ের নিকট স্বামীর মঙ্গলকামনায় আত্মবিসর্জন করিয়া রহিয়াছে।' একারণেই ১২৯২-র ১১ জ্যৈষ্ঠের "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"য় উল্লেখ করা হয়, 'মুসলমানদিগের গ্রন্থ

এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।' সেইসঙ্গে তিনি যখন কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে 'ভীমগর্জন' 'ভীম-নাদ' বা 'ভীমনিনাদ' প্রভৃতি হিন্দুপুরাণাশ্রিত শব্দ ব্যবহার করেন, তখন বোঝা যায়, শব্দব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। এখানে তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে প্রচলিত ভাষারীতিতে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের অধিকতর যোগ্য এবং কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন। সেজন্যে তিনি 'প্রভু মোহম্মদের সমাধিমন্দির' (মহরমপর্ব, চতুর্দশ প্রবাহ) লিখতে এতটুকু ইতস্তত করেন না। বাঙলাভাষী পাঠকদের কাছে অধিকতর বোধগম্য হবে ভেবেই মীর লিখেছেন, 'পঞ্চদশ রথী মিলিয়া বাণাঘাতে সীমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে।' (উদ্ধার-পর্ব, বিংশ প্রবাহ)। তৎকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রসর হওয়ার কারণে বাঙালি পাঠকদের এক বৃহৎ অংশ হিন্দু পাঠকরা যাতে "বিষাদ-সিন্ধু"র মধ্যে বর্ণিত মুসলিম প্রসঙ্গগুলো বুঝতে পারেন সেজন্যে লেখক ব্র্যাকেটে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অথবা টীকা সংযুক্ত করেছেন। ব্র্যাকেটে জলের অভাবে মৃত্তিকা দ্বারা শরীর পরিশুদ্ধ করবার পদ্ধতি তয়ম্মুমের ['তয়মুখ'] (উদ্ধারপর্ব, পঞ্চবিংশ প্রবাহ) উল্লেখ বা ওইভাবে স্বর্গীয় দূত আজরাইলের পরিচয়প্রদান (দ্বিতীয় প্রবাহ, এজিদ-বধপর্ব) অথবা হজরতের (দঃ) সহধর্মিণী বিবি সালেমার প্রসঙ্গে টীকায় তাঁর বিবিগণের বিস্তৃত তালিকা আর বর্ণনা এর উদাহরণ। আবার মুসলিম বিবাহে মোহরানার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক সরাসরি বলেন, 'এইস্থানে হিন্দু পাঠকদের নিকট বলিবার আছে।' এইসব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন একটি সক্ষম গদ্যরীতি গড়ে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্য দিয়ে পাঠকদের সঙ্গে গভীরতর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতেই তিনি যখন "বিষাদ-সিন্ধু"তে 'টেলিস্কোপ'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'দূরদর্শন' লেখেন, তখন এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ আর উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর সম্পাদিত "আজিজন নেহার"-ও অনুসৃত গদ্যরীতি। ১৮৭৪-এর এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এই 'মাসিক পত্র' সম্পর্কে পরবর্তী মাসেই প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেটে' বলা হয়, 'এই পত্রিকা কয়েকজন মুসলমান যুবকের লেখনীবিনির্মুক্ত সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত।···দেখুন···মহম্মদীয়গণ মধুময় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ স্বাদ গ্রহণে কেমন সমর্থ হইয়াছেন।' এই সাধু গদ্যরীতি পরবর্তী কালে মুসলমান-সম্পাদিত পত্র "মিহির" (১৮৯২) ও "হাফেজ" (১৮৯৭) হয়ে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর "বসন্তকুমারী নাটক" 'মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর'কে উৎসর্গ করলেও তাঁর অভিমত মুসলমানদের উর্দু চর্চার বিপরীতে নিম্নশ্রেণীর মুসল-মানের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষায় আরবি-ফারসি-কণ্ঠকিত বাঙলা চর্চার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে ছিল মীরের বিশ্বাস আর অবস্থান।

মীরের অনুসৃত ভাষা-রীতি-বিষয়ক এই আলোচনা থেকে আমরা দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি। (১) মীর তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা এবং পরিপার্শ্ব থেকে ভাষাবিষয়ক চিন্তাটিকে লালন এবং বিকাশ করেছেন। (২) ঐ মৌল চিন্তার একটি ঐক্য আর ধারাবাহিকতা রয়েছে। তার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু লেখক ওই মৌল বিষয় থেকে বিচ্যুত হন নি। সিদ্ধান্তদ্বয় শুধু মীরের ভাষা বা গদ্যরীতি সম্পর্কেই নয়, তাঁর বিষয় সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। সাহিত্যচর্চার জন্যে মীর যে প্রধানত তাঁর অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করেছেন, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আত্মজৈবনিক: উদাসীন পথিকের মনের কথা, আমার জীবনী, গাজী মিঁয়ার বস্তানী ও বিবি কুলসুম। "উদাসীন পথিক" যদিও পরে প্রকাশিত হয়, তবু দৃশ্যত পূর্বে প্রকাশিত রচনাসমূহে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমাণ করে, এটি পরবর্তী সময়ে লেখা হলেও তার

বিষয়সমূহ লেখকের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতারই অংশ ছিল। কারণ, এখানে লেখকের পিতামাতার দাম্পত্য-জীবন আর তাঁর বাল্যজীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নেয়া যাক। "উদাসীন"-এ মীরের পিতার দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে তাঁর ও দেবীপ্রসাদের কথোপকথন এভাবে বর্ণিত হয়েছে। পিতা, সাঁওতার মীর বলছেন, 'আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে, শরীরের অবস্থার সঙ্গে সংসারীর অনেক কার্যে যোগ আছে।' 'দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—আপনি যদি বয়সের কথা পাড়েন, তবে ত আমরা গিয়াছি। বড় মীর সাহেব আমার ছোট ছিলেন। বয়সে কি করে?' আর "বসন্তকুমারী নাটক"-এ রাজা ও প্রিয়ম্বদের সলাপ :

রাজা। —তাও মানলেম। বয়সের কি? এ বয়সে কি আর বিবাহ সাজে?

প্রিয়। —সে কি মহারাজ, বলেন কি? কিসের বয়েস! আপনার চুল পেকেছে? কৈ? আমি ত একটিও পাকা দেখতে পাই না।

আবার মীরের এই প্রথম নাটকে যে রূপজ মোহের ফলে রাজা বীরেন্দ্রের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে, সেই একই 'নিয়ন্ত্রক' "বিষাদ-সিন্ধু"র ট্রাজেডিরও কারণ। মহরম-পর্বের দ্বাবিংশ প্রবাহের শুরুতে লেখক যে 'প্রণয়, স্ত্রী, রাজ্য, ধন'—এই চারটি ভয়ানক লোভের কথা বলেছেন তার প্রথম দুটির দ্বারা ওই মোহকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। "বসন্তকুমারী"-তে রানী রেবতী সৎপুত্র নরেন্দ্র সিংহের প্রতি আসক্ত আর "বিষাদ-সিন্ধু"-তে এজিদ মোহগ্রস্ত পরস্ত্রী জয়নাবের প্রতি। নাটকের অন্তিমাংশে রাজা বীরেন্দ্র যেমন ওই মোহজনিত সর্বনাশে বিলাপ করে, তেমনি এজিদের স্বগতো-ক্তিতেও তা প্রতিধ্বনিত হয়, 'কেন হেরিলাম? সে জ্বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাইলাম? হায়! হায়!! ···কি প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কিনা ঘটিল! কত প্রাণ—ছি! ছি! কত প্রাণ বিনাশ হইল।'

"উদাসীন পথিকের মনের কথা"-র শেষাংশ 'পরিণাম'-এ কেনীর পতনের পর গোয়ালন্দে রেলপথে কোমপানির উত্থানের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। যদিও পদ্মার বুকে বাঁধ দেওয়ার প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়, তবু বাল্যকালের ওই স্মৃতিই হয়তো পরবর্তী কালে বন্ধুর অনুরোধে পূর্বদেশগামী রেলপথে কোমপানির গৌরী নদীতে আশ্চর্য সেতুবন্ধনের ওপর তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "গৌরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু" লিখতে অনুপ্রাণিত করে। "উদাসীন"-এ 'ধন্য বিলাতী বুদ্ধি' বলে বাহবা দানের যে পদ্ধতি অনুসৃত তা যেমন "গৌরী সেতু"-তে 'ধন্য ধন্য রাঙ্গা মুখ ধন্য বুদ্ধিবল' হয়ে কবিতার ধুয়া হিসেবে ব্যবহৃত, তেমনি মীরের একটি রচনারীতিতেও রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর প্রধান দুটি রচনা থেকে দুটি উদাহরণ প্রদত্ত হল :

১. ধন্য ইংরেজ! সেই ইংরেজ বিচারপতির কর্ণ-গোচর হইয়াছে। যেই ভেড়াকান্তের কৌশলে এই অত্যাচার কাহিনী তার যোগে জিলার বিচারক সাহেবের গোচর হইয়াছে, তখনি আদেশ, তখনি হুকুম, তখনই কয়েদ খালাসের আজ্ঞা, তখনই রাজকীয় আদেশ, লিখিত পরওয়ানা, খালাসের হুকুম। ("গাজী মিঁয়ার বস্তানী" / অষ্টম নথি)

অবশ্য ব্যঙ্গার্থেও কখনো কখনো এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। ওই একই নথিতে উৎকোচপ্রাপ্ত মণিবিবির পক্ষাবলম্বনকারী পুলিশের নিজিয় ভূমিকায় ভেড়া-কান্ত বলছে, 'ধন্য বিচার! ধন্য শান্তিরক্ষা! ধন্য রে পুলিশ!'

২. ইমাম হোসেনের খণ্ডিত মস্তক রক্ষার জন্যে আজর পুত্র সায়াদ নিজের শির প্রদানে প্রস্তুত হলে তার পিতা বলে, 'ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার-ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত! তোমার জন্ম সার্থক। আমার জীবনও সার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক। ("বিষাদ-সিন্ধু" / উদ্ধারপর্ব, দ্বিতীয় প্রবাহ)।

অন্যদিকে "উদাসীন"-এ উল্লেখিত 'টাকার অসাধ্য কি আছে?' 'বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে'

ইত্যাদি বাক্যরীতি শুধু "গৌরী সেতু"-তেই ('অর্থের অসাধ্য কিছু নাই এ মহীতে) নয়, বরং মীরের অন্যান্য প্রধান রচনায়ও একটি সাধারণ লক্ষণে পরিবর্তিত হয়েছে। "উদাসীন"-এ যেমন দশম তরঙ্গে দেখি প্যারীসুন্দরী ভাবছেন 'চেষ্টার অসাধ্য কি আছে ?' তেমনি "বিষাদ-সিন্ধু"-তে জায়েদা বিষপান করিয়ে হাসানকে হত্যার চক্রান্তের সময় (মহরমপর্ব, চতুর্দশ প্রবাহ) এবং জনৈক ঘাতক হজরতের রওজায় ওই একই কার্যে নিয়োজিত হওয়ার সময় হুবহু এই বাক্যের সাহায্যে নিজেদের মনোবলকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করে। আবার জায়েদার হাসানকে বিষ পান করানোর কয়েকটি চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে যখন হতাশ হয়ে পড়ে তখন মায়মুনা তাকে বলে, 'চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।' অর্থপ্রসঙ্গেও এই বাক্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। "জমীদার দর্পণে"-র হারওয়ান আলী যেমন বলে 'টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি ?' (দ্বিতয়ী অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) তেমনি "গাজী মিঁয়ার বস্তানী"-র দ্বিতীয় নথিতে সাবলেট ও দাগাদারীর প্রশ্ন 'টাকার অসাধ্য আছে কি ?' 'টাকার অসাধ্য কি আছে ?' এর জবাব হিসেবেই যেন অষ্টাদশ নথিতে জানা যায়, 'টাকার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই।'

"বিষাদ-সিন্ধু" যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে রচিত, এবং তা লেখকের ধর্মবিশ্বাস- আর ভক্তির দৃষ্টিকোণ -প্রভাবিত, তবু তাতে বিষয়ের ব্যবহার থেকে বুঝতে অসুবিধে নেই, মীরের শিল্পোকরণ, শিল্প-রীতির ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা এখানেও অনুসৃত। অর্থবিষয়ে লেখক যে অভিজ্ঞতাকে এখানে চিত্রিত করেছেন, অন্য রচনাসমূহে তার উপস্থিতি থেকে মনে হয়, "বিষাদ-সিন্ধু"-তেও তিনি তাঁর পটভূমি থেকে আহৃত উপকরণ আর উপলব্ধিকেই কাজে লাগিয়েছেন। সীমার যখন ইমাম হোসেনের কর্তিত শির নিয়ে এজিদের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের জন্যে দামেস্কের উদ্দেশ্যে দৌড়চ্ছে (উদ্ধারপর্ব, দ্বিতীয় প্রবাহ) তখন লেখক বলেছেন, 'অর্থ ! হায়রে অর্থ ! হায়রে পাতকী অর্থ। তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নিতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ। বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন, বিনাস, এ সকল তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি! কি মধুমাখা বিষ-সংযুক্ত প্রেম, রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত—মহাব্যস্ত—প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমারই জন্য—কেবলমাত্র তোমারই কারণে—কত জনে তীর, তরবারী, বন্দুক, বর্শা, গোলাগুলি অকাতরে বক্ষ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে। তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবিতেছে। ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, পর্বতশিখরে আরোহণ করিতেছে, রক্ত মাংস পেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর ! ছলনে ! তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক ! কি মায়া ! কি মোহিনী শক্তি !! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে ? কে না ধোকা খাইতেছে ? কে না মজিতেছে ?' এই উদ্ধৃতিতে টাকার জন্যে সমূহ সর্বনাশের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, আর তার ফলে নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তা মীর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছেন। তাঁর পিতা তাঁর (পিতার) ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাই কর্তৃক ভিটামাটিচ্যুত হন, নানা-স্থানে ভ্রমণশেষে কুষ্টিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। এজন্যে "উদাসীন পথিকের মনের কথা"র সপ্তম তরঙ্গ "ঘরজামাই"-এ উদাসীন পথিক বলছে, 'রে অর্থ ! রে জমিদারী। তোরা ঘটাতে না পারিস এ জগতে এমন কুকার্যই নাই। মায়া মমতা স্নেহ দয়া ধর্ম্ম সকলই স্বার্থের নিকট পরাস্ত। তোদের নিকট জিয়ন্তে বলি।' এ কারণে এ গ্রন্থের মুখবন্ধে উদাসীন পথিক জানাচ্ছে, 'সংসারে আমার স্থায়ী বসতিস্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই।···কার্য ও ব্যবহারেই মায়া—সংসারময় স্বার্থের অপছায়া।'

"বিষাদ-সিন্ধু"-র 'রাজা-প্রজা'-র বৈরীভাবের পেছনে যে অর্থকে মীর সক্রিয় দেখেছেন, তাও তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা। "উদাসীন পথিকে"-র দ্বাদশ তরঙ্গে (বিলাতী বুদ্ধি) মীর বলছেন, 'রে টাকা ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। পরের জন্য, পরের প্রয়োজনীয় মাথার জন্য জলে ঝাঁপ, সম্মুখ শত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষ বিস্তার, লাঠির তলে মস্তক দান ! রে টাকা ! তোর জন্যই কেনী, বিলাত পরিত্যাগ। তোর জন্যই নীলের ব্যবসা। জমিদারের পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার—পিশাচি ! তোর জন্য আজ এই বাঙ্গালী যুদ্ধ। পরিণামফল ভবিষ্যৎগর্ভে। জয় পরাজয় অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি, জয় পক্ষেও তুমি। তোমারই জয়, জগতে তোমারই জয় !!' টাকার এই ক্ষমতা মীর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেছেন। দেলদুয়ারে জমিদারি এসটেটের ম্যানেজার হিসেবে লব্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁকে "গাজী মিঁয়ার বস্তানী"র বেগম ঠাকুরণ চরিত্র অঙ্কনে সাহায্য করেছে। ঐ বেগম ছদ্মবেশী উকিলকে বলছে, 'টাকাই তোমাদের মা-বাবা, টাকাই তোমাদের স্বর্গ-পুণ্য, টাকাই তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম।' (দ্বাদশ নথি)। আবার সপ্তদশ নথিতে উকিল বলছে, 'টাকাই আমাদের পুত্র, টাকাই পরিবার, টাকাই বন্ধুত্ব, টাকাই সকল। টাকা ! টাকা ! টাকা ছাড়া কোন কথা নেই।' একারণেই "জমিদারদর্পণে"-র হায়ওয়ান আলী বলে, 'এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত। টাকার জোরে কি না হয় ?' (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

"বিষাদ-সিন্ধু"-তে লেখকের পূর্বোক্ত মন্তব্যের পরে আজর-গৃহে রাত্রি যাপনের পর পরের দিন প্রাতে সীমার তার কাছে গচ্ছিত হোসেন-মস্তক ফেরত চাইলে সে যখন তার মানবিক অনুভূতির কাছে আবেদন করে, তখন অর্থের জন্যেই আজর ঐ মস্তক হস্তগত করতে চায় ভেবে তাকে বলে, 'মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমন ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতাভগ্নীর নিকট কথাটার প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল ত জগতে আর কে আছে ? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই ; কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা। জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ, তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি।' সীমার যদিও নেতিবাচক চরিত্র, তবু তার মন্তব্যে মীরের অভিজ্ঞতার নির্যাস লক্ষ করি। মীর যে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই সীমারের বক্তব্যে চালান করে দিয়েছেন তার অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। "বিবি কুলসুম"-এ মীর জানিয়েছেন, ১২৯২-এর দিকে তাঁর পরিবারে প্রচণ্ড আর্থিক অনটন দেখা দেয়। তাঁর কথায় 'ভাতে কাপড়ে কষ্ট।' মীরের "বিষাদ-সিন্ধু" তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। প্রথম কিস্তি মহরমপর্ব ১২৯১-এ, দ্বিতীয় কিস্তি উদ্ধারপর্ব ১২৯৪-এ এবং তৃতীয় পর্ব এজিদ-বধপর্ব ১২৯৭ সালে। "বিষাদ-সিন্ধুর"-র বর্তমান উদ্ধৃতিটি উদ্ধারপর্বের দ্বিতীয় প্রবাহ থেকে নেয়া। অতএব দেখা যায়, এই পর্বটি তিনি ১২৯১-এর পরে ও ১২৯৪-এর আগে রচনা করেন। যেহেতু এটি দ্বিতীয় প্রবাহ, সেহেতু ১২৯২ বা তার কিছুকাল পরেই এটি রচিত হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক। যদি তাই হয়, তাহলে হয় ওই আর্থিক অনটনের সময়ে অথবা তার তীব্র প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে কার্যকর থাকার সময়ই তিনি এটি রচনা করেছেন। 'ভাতকাপড়ের কষ্ট' কিংবা তার তীব্র স্মৃতিই তাঁকে দিয়ে এ বাক্য লিখিয়ে নিয়েছে যে 'জগৎ এমন ভয়ানক স্থান যে টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই।' সে কারণেই বিবি কুলসুম স্বাধীনতা ভালো-বাসলেও কিংবা রঙ্গলালের কবিতা তাঁর প্রিয় হলেও স্বদেশী কর্মকাণ্ড ও দেশহিতব্রতী সভায় যোগ দিয়ে

মীরের পরিবারকে অস্বস্তিকর আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ফেলাকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। 'ভাত-কাপড়ের কষ্ট' মূলত মীরকে তাঁর পত্নীর মতামত অনুমোদনে বাধ্য করে। তিনি তাই "বিবি কুলসুম"-এ বলেন, 'যাঁহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐসকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। ঘুরেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় করিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিতসাধনসভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভাসমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নহি।' [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

গত ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় জাতীয় নাট্যমেলার পর্যালোচনায় স্থানাভাবে দুটি অনুচ্ছেদ ছাপা সম্ভব হয় নি। অমুদ্রিত অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

—আক্ষোচ্চারিত এই প্রশ্নের উত্তরে উদ্যোক্তা "নান্দীকার" যখন আশা ব্যক্ত করেন যে নানা প্রাদেশিক নাট্যকর্মের সঙ্গে এই পরিচয় হয়তো আমাদের থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, তখন ঐকান্তিক প্রার্থনায় বলি 'তাই যেন হয়, তাই যেন হয়'। নাভিশ্বাস যার উঠেছে এই সঞ্জীবনী সেবনে অন্তত যেন তার হৃত সামর্থ্য ফিরে আসে।

যদিও জানি, ইতিহাস বলবে যে শিল্পচর্চা স্রোতোহীন ক্ষুদ্র গহ্বরে পড়ে আবিল হয় মাঝে-মাঝেই। একেকটা যুগ আসে বন্ধ্যাত্বের, সংশয়ের, দিশাহীনতার। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন তখন থমকে থাকে। সময়ের মুখ চেয়ে অপেক্ষায় থাকে। আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক কার্যকারণের টানাপোড়েনে উপস্থিত হয় মহাক্ষণের লগ্ন। ভগীরথের হাতে বন্ধনমুক্তি ঘটে। শিল্পচর্চা আবার স্রোতস্বিনী হয়। কিন্তু স্বপ্নটাকে—আকাঙ্ক্ষাটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হয়, কী জানি, নইলে যদি লগ্নভ্রষ্ট হতে হয়। তাই আজকের এই-সমস্ত ঈর্ষা-কলহ, গোষ্ঠীবদ্ধদের পারস্পরিক পিঠ-চুলকোনি, চিন্তার আবিলতা, সামর্থ্য অর্জনে আলস্য, তোষণ আর পোষণে ক্ষমতা-অর্জনের লিপ্সা, সম্মাননীয়কে পরিতুষ্ট এবং শ্রদ্ধেয়কে কর্মমাত্র করার প্রবণতা, অহং-সর্বস্বতা অথচ আত্মমর্যাদাবোধহীনতা সত্ত্বেও সমস্তবিধ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে অতি যত্নে ওই আকাঙ্ক্ষাটাকে, স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। "নান্দীকার"-আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলার প্রতীকটির তাৎপর্য সেখানেই। যাঁরা রাত জেগে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকেন এইসব নাট্যাভিনয়ের দর্শনাধিকার অর্জনের জন্য, আর যাঁরা মঞ্চে এবং নেপথ্যে তাঁদের 'প্রেমের পরিশ্রমে' সদা-নিরলস, সেই-সমস্ত নাট্য-প্রেমীরা যদি এই তাৎপর্যটুকু সম্বন্ধে সচেতন থাকেন তবে যে উদ্দেশ্যে এই নাট্যমেলার আয়োজন, বা আজও এই অভাগা প্রদেশে বিচ্ছিন্ন এবং একক প্রচেষ্টায় 'ভালো নাটক ভালো করে করা'—তা সার্থক হবে। এবং তাহলেই হয়তো আমাদের বাঙলা নাটক মুখোশ ত্যাগ করে একদিন তার নিজস্ব মুখ খুঁজে পাবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য

মানবেন্দ্রনাথ রায় *The Historical Role of Islam* গ্রন্থের Islam and India-র শেষ পরিচ্ছেদে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, 'প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলে সেই বিশৃঙ্খল ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারতীয় সমাজকে বাঁচিয়ে দিতে মুসলমানেরা অকুণ্ঠভাবে যে দান করেছে তা হিন্দুরা যতদিন হৃদয় দিয়ে অনুধাবন না করে ততদিন মুসলমানেরা ভারতীয় জাতিরই যে এক অখণ্ড অংশ —এ বোধ তাদের কিছুতেই হবে না।' (মুহম্মদ আবদুল হাই-কৃত অনুবাদ। 'ইসলামের ইতিহাসিক অবদান: ভারতবর্ষ ও ইসলাম," পৃ ১২০-১২১, ১৯৪৯)। এই বোধের পরিবর্তন হয় নি। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পরও ব্যবধান আরও বেড়েছে। ওপার-বাঙলায় আত্মজিজ্ঞাসার যে প্রদীপ শিক্ষিতজনরা নানা বাধাবিপত্তি-সংকট-সমস্যার মধ্যে জ্বালিয়ে তুলেছেন, সে সম্পর্কে এপারের শিক্ষিতজন উদাসীন রয়েছেন। বাঙলা ভাষাকে মর্যাদাদানের জন্য যে মরণপণ সংগ্রাম তাঁরা করেছিলেন, মা আর মাতৃভাষা যাঁদের কাছে অভিন্ন, সেই সংগ্রামী মনোভাব কিংবা ভাষার প্রতি ভালোবাসা এপার-বাঙলায় পাওয়া যায় না। অথচ সেই আগুনের কিঞ্চিৎ উত্তাপও যদি এপার-বাঙলায় ক্ষয়িষ্ণু জবিষ্ণু মৃতপ্রায় সাহিত্যিক সমাজে এসে পড়ত, তাহলে আজকের সাহিত্যের চেহারা পালটে যেত। দেশবিভাগের আগেও একবার চেহারা পরিবর্তনের সুযোগ এসেছিল —তখনও আমরা উপেক্ষা করেছি। আমি ঢাকার বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের কথা বলছি। "কল্লোল"-এর প্রায় সমকালীন ঘটনা এটি। "কল্লোল" কলকাতায় বাস্তবতার নামে এক ধরনের ভালগারিটির প্রশ্রয় দিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তাপচা ধ্যানধারণাকে বাঙলা সাহিত্যে আমদানি করেছিল; কিন্তু ঢাকায় সমস্ত প্রকার ধর্মীয় কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আধুনিক জগতের ভাবনা-চিন্তার দ্বারা স্বচ্ছ, সুস্থ এবং যুক্তি-ভিত্তিক চিন্তার প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ১৯২৬ সালে যে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার খবর তেমন পৌঁছয় নি—পৌঁছলে অন্তত সে সম্পর্কে এ-বাঙলার কোনো শিক্ষিত-জন বই না লিখুন, অন্তত ছোটখাট প্রবন্ধও লিখতেন। "কল্লোল"-কে নিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন "কল্লোল যুগ", জীবেন্দ্র সিংহ রায় লিখলেন "কল্লোলের কাল", আর বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে হল ওপার-বাঙলার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সহ-যোগী অধ্যাপক খোন্দকার সিরাজুল হককে—বইয়ের নাম "মুসলিম সাহিত্য -সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম"।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। শরৎ পাবলিশিং হাউস, ৯/৪ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯। অগস্ট ১৯৮৭। পঁয়ত্রিশ টাকা।

কল্লোল থেকে এই আন্দোলনের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী—বাংলাদেশে মৌল-বাদের বিরুদ্ধে অধুনা সাহিত্যের যে প্রগতিশীল ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে সেদিনকার আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও যে একঝাঁক প্রাণবন্ত নবীন তেজী লেখক সেদিন জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁদের আরব্ধ কর্মকে পূর্ণ করে তোলার দায়িত্বে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের লেখকরা যেন দায়বদ্ধ—বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যধারা থেকে এই কথাটি বেরিয়ে এসেছে।

কথাটা বললে বিশ্রী শোনাবে, কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না—দেশবিভাগের অনেক আগে থেকেই সংস্কৃতিজগৎ দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি উদাহরণ দিয়েছি, এবার আরও কয়েকটির কথা বলি। কলকাতা আর ঢাকা—দুটি জাতির সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় এক-দিকে "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", অপর-দিকে "সওগাত", "মোহম্মদী"; ঢাকায় একদিকে "শিখা", অপরদিকে "প্রগতি", "প্রাচী"। হিন্দু-মুসলমানের দূরত্বের ব্যবধান এমনভাবে রচিত হয়েছিল যে কোনো সংকলনগ্রন্থে নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের কথা, যেমন দৌলতকাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ্, আলী রাজা, হামায় মামুদ প্রভৃতি বাদ দিলাম, আধুনিক কালের ফরুখ আহমদ, আহসান হবীব, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ যাঁরা কলকাতায়

সাহিত্যচর্চা করে খ্যাতিমান হয়েছেন, বিশেষ করে ফররুখ আহমদ যিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-র মত কবিতায় এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই অভাববোধ থেকে ১৯৪৫ সালে রেজাউল করিম এবং আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় "কাব্যমালঞ্চ" বেরিয়েছিল, এবং ওই গ্রন্থে আবদুল কাদির বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের ক্রমবিকাশে বাঙালি মুসলমানের দান সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। কবিতার সংকলন যেমন বেরিয়েছিল, তেমনি তাঁর সম্পাদনায় মুসলিম লেখকদের গল্পসংকলনও বেরিয়েছিল ওই সময়ে। এইসব দেখেশুনে রবীন্দ্রনাথকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, 'চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না, সে আমাদের অগোচর; তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলা-দেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলা-দেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে।' ব্যবহারের সংশোধন করি নি, কাজেই দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। জিন্নাহকে খামোখা একতরফা দোষ দিয়ে লাভ নেই—নিজেদের অন্তরের দিকে তাকালেই সদুত্তর খুঁজে পাব।

বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যে মুসলমানদের ভূমিকা বিষয়ে যখন এক পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব থেকে-ছেন, স্বভাবত তখন তাঁদের লিখিত ইতিহাসের মুকুরে বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের মুখ দেখতে পেলেন না। যে ইতিহাস এতদিন চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল কিংবা দেখেও না দেখার ভান করা হয়েছিল, বাঙলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর বাঙালি মুসলমানরা সেই ইতিহাসের সন্ধান করে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যে নিজেদের ঐতিহ্যের শিকড় খুঁজে পেলেন। ফলে ওপার-বাঙলার সাহিত্যে এক গঠনমূলক কর্মধারার বন্যা এল। তখন আর মুসলিম-রচিত সাহিত্যকে রোখা গেল না। প্রথম-প্রথম এ সাহিত্যকেও উপেক্ষা করা হয়েছে, এধারের শিক্ষিতজন তখনও মনে করেছেন ওরা আবার কী লিখবে! কিন্তু বেশিদিন এই নাক-উঁচু মনোভাব বজায় রাখা গেল না। ওপারের সাহিত্য নিজের কব্জির জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে—কারুর দয়ার ওপর নির্ভর করে নয়। রীতিমত পৌরুষের কাজ, কারণ দেশভাগের পর সব সাহিত্যিকরাই এধারে চলে এসে-ছিলেন, ঘর গোছাবার দায়িত্ব পড়ে-ছিল তাঁদেরই হাতে যাঁদের এপারের চলে-আসা লেখকরা অর্বাচীন বলে মনে করতেন। অর্বাচীন লেখকরাই সমগ্র বাঙলা সাহিত্যকে অর্থাৎ চর্যাপদ থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত নিজেদের এলাকা বলে গ্রহণ করে এমন এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুললেন যার পরিচয় দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হল।

১৩৫৮ শারদীয় "সত্যযুগে"ই প্রথম এই প্রয়াস শুরু হয়েছিল—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় "সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যচর্চা" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। পরে ওই প্রবন্ধটি "পূর্ব-পাকিস্তানের নতুন সাহিত্য" নামে "আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য" (১৩৬১) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল (পৃ ২৩২-২৪৭)। তিনিই এপারের অনাগ্রহী শিক্ষিতজনের বন্ধ জানালা প্রথম খুলতে চেষ্টা করেছিলেন। "দেশ" সাহিত্য-সংখ্যায় কয়েক বছর পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যচর্চার খবরাখবর ওপারের কয়েকজন লেখকদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল, এবং নির্বাচিত পুস্তকতালিকায় পূর্বপাকিস্তানে প্রতি বছরে প্রকাশিত বাঙলা বইয়ের তালিকাও দেওয়া হত। এরপর অন্নদা-শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে ১৩৫৯ সালের ১৫ থেকে ১৭ ফাল্গুন সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্যমেলায় উভয় বঙ্গের পাঁচ বছরের সাহিত্য (১৩৫৪-১৩৫৯) নিয়ে এক আলোচনাসভা হয়। এই আলোচনা-সভায় পূর্ব পাকিস্তানের লোক-সাহিত্যের ওপর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, কবিতার ওপর শামসুর রাহমান, কথা-সাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যের ওপর কাজী মোতাহার হোসেন আলোচনা করেন। পরে সাহিত্যমেলায় অনুষ্ঠিত যাবতীয় আলোচনা এবং পঠিত প্রবন্ধের এক সংকলনগ্রন্থ বেঙ্গল পাবলিসার্স থেকে বেরোয় (১৩৬০)। অরুণ সেন-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক "সাহিত্যপত্র"-এ বিষ্ণু দে-র "পূর্ববঙ্গের কবিতা" (চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০, পৃ ৩৯-৪৭), অসীম রায়ের "পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক জাগরণ" (শারদীয় ১৩৭৫, পৃ ১৪৮-১৫০) উল্লেখ-যোগ্য রচনা। ইতিমধ্যে নিখিল সেন "এশিয়ার সাহিত্য" নামক গ্রন্থে (১৯৭১) পাকিস্তানের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে উর্দু বেলুচ সিন্ধি পানজাবি সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্যেরও আলোচনা করেন (পৃ ৫৩০-৫৬৪)। এ ছাড়া আরও কিছু পত্র-পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা বেরিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরের সময় এধারের প্রতিটি কাগজে (কি দৈনিক কি মাসিক কি ত্রৈমাসিক সব পত্র-পত্রিকায়) সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। "পরিচয়"ও বাংলাদেশ সংখ্যা বের করেন। এইসব আলোচনা বিক্ষিপ্ত-ভাবে হয়েছে, পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, ধারাবাহিকতাও সর্বক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নি। বাংলাদেশ কায়েম হবার পর বাংলাদেশের কবিতার ওপর গবেষণা করে মধুসূদন চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডিও পেয়েছেন। তাঁর গবেষণা-পত্রটি "বাঙলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা" নামে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮২ জানুয়ারি)। তাঁর গবেষণার কালসীমা ছিল ১৯৪১-১৯৭১ অর্থাৎ পাকিস্তানি আমল পর্যন্ত। এই প্রথম এ বাঙলায় ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক পরিচয় গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করলেন। যাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কৌতূহলী, সাহিত্যের খবর জানতে চান, তাঁরা এ বইটি থেকে একটি ধারণা পাবেন। হাতের সামনে বইটি রেডি রেফারেনস হিসেবে কাজ দেবে। মোট বারোটি অধ্যায়ে শ্রী মুখোপাধ্যায় বইটি বিন্যস্ত করেছেন। সূচী হল নিম্নরূপ—বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন : ১৯২৬-১৯৮৬ পৃ ১-১৭ / বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীর সমস্যা পৃ ১৮-৪৩ / বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীর অগ্রগতি, পশ্চাদ্‌গতি পৃ ৪৪-৫৪ / বাংলাদেশের উপন্যাস : তাত্ত্বিক পট-ভূমি পৃ ৫৫-৬৪ / বাংলাদেশের উপন্যাস : ১৯৫২-১৯৭২, পৃ ৬৫-১০২/ বাংলাদেশের উপন্যাস : ১৯৭৩-১৯৮৪, পৃ ১০৩-১৩৭ / বাংলাদেশের ছোটগল্প : ১৯৫২-১৯৮২, পৃ ১৩৮-১৫২ / বাংলা-দেশের কবিতা : ১৯৪০-১৯৮২, পৃ ১৫৩-১৬৯ / বাংলাদেশের প্রবন্ধ : ১৯৫১-১৯৮২, পৃ ১৭০-১৯৮ / বাংলা-দেশে পরিভাষা-চর্চা পৃ ১৯৯-২১০ / বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধান পৃ ২১১-২২৪ / সাম্প্রতিক বাংলাদেশ : শিক্ষা সাহিত্য মনন পৃ ২৪৫-২৩৪ / পরিশিষ্ট : ক. বাংলাদেশের কাব্য : নির্বাচিত তালিকা ১৯৫২-১৯৮২, পৃ ২৩৫-২৪০ / খ. বাংলাদেশের ছোট-গল্পগ্রন্থ : নির্বাচিত তালিকা ১৯৫২-১৯৮৬, পৃ ২৪১-২৪৫ / গ. বাংলা-দেশের উপন্যাস : নির্বাচিত তালিকা ১৯৪৮-১৯৮৪, পৃ ২৪৬-২৫১।

আজ বাংলাদেশের সাহিত্যসম্পদ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার একেবারে গোড়ায় ছিল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। শ্রী মুখোপাধ্যায় সঠিক জায়গা থেকেই কথা শুরু করেছেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল বক্তব্য হচ্ছে 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে শ্রীমুখোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটি যথার্থ, '১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখ তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তা ষাট বছর পরে আজকের বাংলাদেশে হয়েছে আরও গভীর, আরও আন্তরিক আরও পরিব্যাপ্ত' (পৃ ১৭)। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস আরও চিত্তাকর্ষক হত যদি আন্দোলনের বার্ষিক মুখপত্র "শিখা"র ছ বছরের সূচী তুলে দিতেন। এপারের লোকেরা বুঝতে পারতেন শুধু ওই তিনজনই নন, আরও অনেক তরুণ মিলিত হয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মতো বাংলাদেশের সাহিত্যে আর-একটি দিকনির্দেশক ঘটনা ভাষা আন্দোলন। কেন জানি না শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বললেন না, যদিও কবিতা উপন্যাস ছোটোগল্প প্রবন্ধ আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে ভাষা আন্দো-লনের কথা তিনি বলেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই-সম্পাদিত ষাণ্মাসিক "সাহিত্যপত্রিকা"র ১৩৬৮ শীত, ১৩৭৩ বর্ষা দুটি সংখ্যায় হাসান হাফিজুর রহমান "পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য" (পৃ ৮৫-১৪৮/ পৃ ৬৭-১১৮), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৩৬৯ বর্ষা সংখ্যায় "পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যসাহিত্য" (পৃ ১৮৫-২২০) নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত দুটি প্রবন্ধেই ভাষা আন্দোলনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। ভাষা-আন্দোলনকে বাঙলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন বলে মুহম্মদ নুরুল হুদাও উল্লেখ করেছেন। ভাষা-আন্দোলনের ওপর মাহবুবুল আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার উল্লেখ শ্রী মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে দেখতে পেলাম না, অথচ এই কবিতাটি ভাষা-আন্দোলনের ওপর প্রথম কবিতা এবং প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়। '২১শে ফেব্রুয়ারি' নামে বাংলা একাডেমী থেকে যে ক্যাসেটটি বেরিয়েছে সেই ক্যাসেটে ওই কবিতার কিছু অংশ পাঠ করা হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা-

দেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উপলক্ষে পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সংকলন ও গ্রন্থ প্রকাশ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী সমস্যা সংকট ও উত্তরণের ওপর দুটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমস্যাটি কী শ্রীমুখোপাধ্যায় সেটি না বলে ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ-সংকলন "আমাদের সাহিত্য"-কে অবলম্বন করেছেন, নানাজনের লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা অনেক ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়েছে, নিজের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। শেষে একগাদা লেখকের নাম উল্লেখ করে সমস্যা-সংকট ও সংকট-মুক্তির নিশানা অনুধাবন করে নিতে বলেছেন। পরের অধ্যায়ে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা নিপুণ-তার সঙ্গে তিনি বলেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে-সকল ঘটনা ঘটেছে তাকে পট-ভূমিতে রেখে বুদ্ধিজীবী সমাজ কিভাবে এগিয়েছেন আর পিছিয়েছেন, তার চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের উল্লেখ-যোগ্য অংশ। ভাষার প্রশ্নে বাঙলা না উরদু, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, সামাজিক ও আর্থিক বাধা, সাহিত্যকে ইসলামীকরণ, লোকায়ত আচারের প্রতি কটাক্ষ সংস্কৃতির স্বাভাবিক অগ্র-গতিকে রুদ্ধ করে পরিকল্পিত উপায়ে বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ককে সাফ করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সাহিত্যকে উৎসাহ দেওয়া, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় বুদ্ধি-জীবীদের সাহসিক পদক্ষেপ পূর্ব পাকি-স্তানকে পশ্চিমাদের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন মীর মশারফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'কে প্রথম বাঙালি-মুসলমান -রচিত উপন্যাস বলেছেন এবং এই পথেই উপন্যাস রচনা করার ডাক দিয়ে-ছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা মীরের পথ অনুসরণ না করে ধর্মীয় মিথ থেকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর "কাঁদো নদী কাঁদো"-তে কিভাবে উত্তরণ ঘটেছে তা ঘটনার পর ঘটনা বিশ্লেষণ করে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেছেন, '১৯৪৭-এর ১৪ই অগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটা 'স্বতন্ত্র' সাহিত্য জন্ম নিল, তার পর যা আবহমান বাংলা সাহিত্যের পটভূমি থেকে উদ্ভূত হলেও নতুন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতায় একটি জাতির আলোকিত জন্মের ভিতর এই সাহিত্যের ভিত্তি সূচিত হয়ে বিকাশের পূর্ণতর অগ্রবর্তী স্তরে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা-দেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে আজ বাংলাদেশ সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।' (পৃ ৪৮)

বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম প্রবন্ধ উপ-ন্যাসের তাত্ত্বিক পটভূমি। পূর্ব পাকি-স্তান সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে এক শ্রেণীর লেখক চেয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষাকে বাদ দিয়ে পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষায় সিলেটী আদব-কায়দা আমদানি করে মুসলমানি সাহিত্য গড়ে তুলবেন। "বিষাদসিন্ধু" "আনো-য়ারা"-র ঢঙে উপন্যাস লেখার কথা বলেছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যে বাংলাভাষা ও সাহিত্য আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করতে পারি না। ভারতের অন্তর্গত দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের উরদু-ভাষা হইতে পাকিস্তানের উরদুকে পৃথক করিতে হইবে, এমন কথা ত কাহাকেও বলিতে শুনি না। আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের সহিত স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইংরাজী ভাষা ত ছাড়ে নাই। অস্ট্রো-হাঙ্গারী ও জার্মানী দুটি পৃথক রাষ্ট্র ছিল কিন্তু তাদের তো একই জার্মান ভাষা ছিল।' (সিলেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ১৯৫৩) পূর্ব পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীর এক শ্রেণী ইসলামি সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হলেও বৃহৎ শ্রেণী ওই মতের অনুবর্তী ছিলেন না। তাঁরা সামগ্রিক-ভাবে বাঙলা সাহিত্যকে সামনে রেখে একটি মানবমুখীন বাস্তবমুখী জীবনচেতনার পত্তন করেছিলেন এবং এই ধারাটি বাংলাদেশের উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সরদার জয়েনউদ্দীন বলেছেন, "আনোয়ারা" "বিষাদসিন্ধু" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীদের চিন্তার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে পায়ের নীচে মাটিকে স্পর্শ করে আনন্দে মেতেছে এখানকার সাহিত্যিকবৃন্দ। এ সত্য অস্বীকার করবার কিছু নেই। এটা যে আমাদের উপন্যাসে জীবন-দানের কথা।' ("আমাদের সাহিত্য", পৃ ১৮৬) আলোচনার স্থবিরার্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় উপন্যাসকে দুভাগে ভাগ করেছেন—প্রথম ভাগ ১৯৫২-১৯৭২ পূর্ব পাকিস্তানি আমল, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৭৩-১৯৮৪ বাংলাদেশী আমল। এই দুই আমলে প্রচুর উপন্যাস বেরিয়েছে, তার মধ্যে প্রথমভাগে তিনি ১০টি উপন্যাসের আলোচনা করেছেন, দ্বিতীয় ভাগে ৩৪খানা উপন্যাসের আলোচনা

করেছেন। উপন্যাস নির্বাচন লেখকের ভালোলাগার ওপর নির্ভর করেছে। নির্বাচনে পাঠক হয়তো নিজের কোনো প্রিয় উপন্যাসের আলোচনা পাবেন না, যেমন আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর আনোয়ার পাশা রচিত "রাইফেল রোটি আওরাত" উপন্যাসের আলোচনা পাই নি। এজন্যে আমার কোনো খেদ নেই, কারণ একজন লেখকের পক্ষে সব উপন্যাস পড়ে আলোচনা করা অসম্ভব। শ্রীমুখোপাধ্যায় যা করেছেন তাতে প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক আর তাঁদের রচনাই আছে।

এবার আমি কিছু-কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে চাই—

১. কিছু-কিছু পুনরুক্তি আছে, কারণ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল, কাজেই প্রবন্ধকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে গিয়ে পুনরুক্তি ঘটেছে। তবে পাঠক যদি বিচ্ছিন্নভাবে প্রবন্ধ পড়েন তাহলে কোনো অসুবিধে হবে না।

২. ছাপার ভুল রয়েছে। যেমন, সঙ্গীবর হবে নজীবর রহমান (পৃ ৫৯), নয়নচাচা হবে 'নয়নচারা' (পৃ ১৩৯) ইত্যাদি।

৩. পরিশিষ্টে লেখক কবিতা-ছোটোগল্প-উপন্যাসের নির্বাচিত তালিকা দিয়েছেন ; অন্যত্রুপ প্রবন্ধ-সমালোচনাগ্রন্থেরও একটি তালিকা দেবার প্রয়োজন ছিল।

৪. শিশুসাহিত্য, লোকসাহিত্য, নাটক, ভাষাতত্ত্ব, অনুবাদসাহিত্য—এই বিষয়গুলির ওপর কোনো আলোচনা নেই। বিশেষ করে লোকসাহিত্য নিয়ে জেলাওয়ারি গভীর ও ব্যাপক চর্চা বাংলাদেশে যেমন হয়েছে, তেমন পশ্চিমবঙ্গে হয় নি। কাজেই এদিকের আলোচনা না থাকায় বইটার কিছুটা অঙ্গহানি হয়েছে বলে মনে করি।

৫. ছোটোগল্প কিংবা প্রবন্ধ-সাহিত্য আলোচনার অধ্যায়ে মুনীর চৌধুরীর নাম কেন পেলাম না, তা বোধগম্য হল না। ছোটোগল্প রচনায় মুনীর চৌধুরীর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত—তাঁর কোনো গল্পসংকলন বেরোয় নি, ওটি কয় গল্প লিখেছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের গল্পসংকলনে, এমন কি ভারত থেকে প্রকাশিত গল্প-সংকলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে মুনীর চৌধুরীর গল্প। তাঁর গল্পের ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। প্রবন্ধসাহিত্যে মুনীর চৌধুরী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'মীর মানস' (১৯৬৫) মীর মশারফ হোসেনের ওপর এযাবৎ যা আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। আর তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' (১৯৬৯)-র তুল্য গ্রন্থ নেই বললেই চলে। বাঙালি লেখকদের ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব কিভাবে পড়েছে এবং বাঙালি লেখকরা ঐতি-হাসিক ঘটনাকে কিভাবে এবং কী উদ্দেশ্যে বিকৃত করেছেন, তার পরিচয় ওই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। গ্রন্থটির নামোল্লেখ করেছেন কিন্তু নামাবলীর মধ্যে বইটি যে বিশিষ্টতম গ্রন্থ পাঠকরা ধরতে পারবেন না। অনেক অপ্রধান প্রবন্ধগ্রন্থের লেখক পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু 'তুলনামূলক সমালোচনা'র নামোল্লেখ করলেই দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না।

৬. এমন কিছু-কিছু লেখকের বইয়ের কথা শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন যেগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও যে বিষয়ের জন্য লেখক বিখ্যাত সেই বিষয় সম্পর্কীয় বইয়ের কথা উল্লিখিত হয় নি। যেমন ড. কাজী আবদুল মান্নানের 'The Emergence and Development of Dobhasi Lite-rature in Bengal' (1966) দোভাষী পুথির এরকম আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নি। ছয় খণ্ডে মীর মশারফ হোসেনের রচনাবলী সম্পাদনাও তাঁর এক কীর্তি। গ্রন্থের ভূমিকায় মীর সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। আর একটি উদাহরণ ড. গোলাম সাকলায়েনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই "বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য" (১৯৬৪)। মুহম্মদ আবদুল হাই এই বইটি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'মর্সীয়ার সংজ্ঞা ও উৎপত্তি বিচার করে ইতিহাস থেকে মুহররমের ধর্মীয় পটভূমি ও তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিক ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।... বাংলাভাষাভাষী জনসাধারণ এ-গ্রন্থেই প্রথমবারের জন্য বাংলায় মর্সীয়া বিষয়ক যাবতীয় রচনার একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা পাবেন।' এই সম্পর্কে আর-একটি কথা জানাই। তাঁর রচিত 'পূর্ব পাকিস্তানের স্ফী সাধক' (১৯৬১) বইয়ের অধুনা নাম বাংলাদেশের স্ফী সাধক (১৯৮২) কিন্তু গ্রন্থমধ্যে সাবেক নামটি আছে (পৃ ১৭৭)।

৭. পরিভাষা, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের কথা লেখক বলেছেন। আর-একটি কোষগ্রন্থের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ড. শেখ গোলাম মকস্দ হিলালী প্রণীত Perso-Arabic Elements in Bengali (1967)—এটি আঞ্চলিক অভিধানের মতো একক প্রচেষ্টায় একটি বড়ো কাজ।

৮. বইয়ের নামকরণে সাহিত্য ও

সংস্কৃতি শব্দ দুটি আছে। সংস্কৃতির পরিচয় নেই, আছে সাহিত্যের পরিচয়। বইয়ের নামকরণ বাংলাদেশের সাহিত্য হওয়াই উচিত ছিল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির কথা ইতিপূর্বে (১৩৭৮) এপার থেকে প্রকাশিত হাসান মুরশিদ রচিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি" গ্রন্থে পেয়েছি। দুটি বই পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

ত্রুটির কর্দ রচনা করা আমার অভিপ্রায় নয়। বইটি আমার ভালো লেগেছে বলেই পরবর্তী সংস্করণের জন্য লেখকের বিবেচনার্থে কয়েকটি প্রস্তাব রাখলাম।

সবশেষে বলি, অনেকদিন ধরে এ ধরনের বইয়ের অভাব ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর তথ্যমূলক হ্যান্ডবুক ছিল না। ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সেই অভাব পূরণ করলেন। বইপত্রের লেনদেন নেই, তবে পাঠক দুদের স্বাদ ঘোলে মেটাবার সুযোগ পাবেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ড. মুখোপাধ্যায় বইটি লিখে দায়মুক্ত হয়েছেন কিন্তু আমাদের তিনি দায়বদ্ধ করলেন। তাঁর বইটি সকলে পাঠ করে দায়মুক্ত হোন, কারণ এপার ও ওপার বাঙলার অখণ্ড সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা সকলেই।

আজহারউদ্দীন খান্

The Social Dimensions of Early Buddhism. Dr Uma Chakravarti. Delhi, Oxford University Press, 1987, Pp 238, Rs 140.

বৌদ্ধধর্মের আদিপর্ব

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে গবেষণা-কর্মে আলোচ্য গ্রন্থটি নবতম সংযোজন। শ্রীমতী উমা চক্রবর্তী দিল্লীর মিরানডা হাউসের অধ্যাপিকা। তাঁর দীর্ঘ দিনের ব্যাপক অনুসন্ধানের ফসল এই গ্রন্থ।

বর্তমান যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমাদের আকর্ষণের একটি প্রধান কারণ এর সামাজিক পটভূমি। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস তথা বুদ্ধের জীবনকথা অনুসন্ধান করতে গেলে সে যুগের সামাজিক বাতাবরণকে জানা একান্ত অপরিহার্য। এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান আলোচনা হলেও শ্রীমতী চক্রবর্তী বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

গ্রন্থে আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত। যে-যে আকরগ্রন্থ এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে লেখিকা অগ্রসর হয়েছেন তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধান পারিভাষিক শব্দসমূহের অর্থও অল্প কথায় স্পষ্ট করে বলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি সুবিস্তৃত। এতে বুদ্ধের সমকালীন রাজনীতিক, আর্থ-নীতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। সে সময় রাজ্যগুলি ছিল রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী। প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য 'গণসঙ্ঘগুলি'র বিবর্তন কৌতূহলোদ্দীপক। ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে রাজতন্ত্রের মুখ্য অনুগামী ছিল মগধ, কোশল, বংশ ও অবন্তী। এদের পরস্পরের মধ্যে এবং গণসঙ্ঘগুলির সঙ্গে সংঘাত দীর্ঘকাল চলে। গণসঙ্ঘগুলির লক্ষণীয় বিশেষত্ব ক্ষত্রিয়সমাজের সঙ্গে এর যোগ। গণসঙ্ঘে প্রকৃত ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এবং ক্ষত্রিয়রা নানাবিধ বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ স্বয়ং ক্ষত্র-বংশোদ্ভূত। বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই গণ-সঙ্ঘগুলির ক্ষমতা কমে আসতে থাকে এবং কোশল আর মগধ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। বুদ্ধের সময়ে দেশে কৃষি আর বাণিজ্যের উন্নতি ঘটায় নগর-মুখিনতার প্রসার ঘটে। ব্যাবসা বাণিজ্য কৃষি কারুশিল্প প্রভৃতির বিকাশের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখিকা সেকালের ভূমিস্বত্ব বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। একটি শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের উদ্ভব হচ্ছিল। এই সমাজে অরণ্যচর উপজাতি আদিবাসীরা কিভাবে গৃহীত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখিকা অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মত উদ্ধৃত করেছেন। ধর্মীয় পরিবেশ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী ছিল দার্শনিক অন্বেষার এক মহান যুগ। যে সময়ে বৌদ্ধধর্মের উদ্‌গম সেকালে পরিব্রাজক বা শ্রমণের আবির্ভাব একটি বিশিষ্ট ঘটনা। পরিব্রাজকবৃত্তি প্রাক্-আর্য যুগেও ছিল। পরিব্রাজকদের মতের বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তথা যজ্ঞপ্রথার বিরোধিতা। 'সমণে'রা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারাদি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিশেষভাবে বিচারপরায়ণ আর তর্কপ্রিয়। এ-সকল বিচার হত 'কূটাগারশালা' বা উদ্যানে। বৌদ্ধ-ধর্মের উপর পরিব্রাজকধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধদের সঙ্ঘ আজীবিক প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের কী সম্পর্ক ছিল তা দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধসমাজে "সঙ্ঘো"র বিবর্তনের ইতিহাসটি মনোজ্ঞ। কিভাবে প্রথম সঙ্ঘের উৎপত্তি হয় এবং ভিক্ষুদের সঙ্গে গৃহীদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানতে পারি। দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বুদ্ধদের যজ্ঞের গৌরব হ্রাস করে-ছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের উপর গৃহস্থদের প্রভাবও নিতান্ত অল্প ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—"গহপতি" অর্থাৎ গৃহপতি সম্বন্ধে। গহপতি বলতে শুধু গৃহস্থকে বোঝায় না, বৌদ্ধসাহিত্যপাঠে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় এ শব্দটির অর্থ বেশ ব্যাপক। বৌদ্ধরা সামাজিক মানুষকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গহপতি। ক্ষত্রিয়ের হাতে ছিল রাজশক্তি, ব্রাহ্মণের হাতে ধর্মীয় ক্রিয়াদি আর গহপতিদের হাতে ছিল আর্থনীতিক ক্ষমতা। দীঘনিকায়ের মহাসুদর্শনসুত্তে রাজচক্রবর্তীর সপ্তরত্নের মধ্যে গহ-পতিকে বলা হয়েছে অন্যতম রত্ন, কারণ গহপতিই ছিলেন প্রকৃত ধনোৎ-পাদক। রাজশক্তির সঙ্গে গহপতির একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল সন্দেহ নেই। সেট্ঠির সঙ্গে গহপতির সম্পর্ক কী ছিল এবং "সেট্ঠি গহপতি" কথার অর্থ কী, তা লেখিকা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে-ছেন। গহপতির সমর্থনের উপর বৌদ্ধ-ধর্ম বহুলাংশে দাঁড়িয়ে ছিল। "গহপতি" ছিল মর্যাদাসূচক অভিধা। গহপতির সঙ্গে "সঙ্ঘো"র সংযোগ এবং "গামনী"র সঙ্গে তার সম্পর্কও আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বিষয়ে কী জানা যায় তার উল্লেখ পাই। এ আলোচনাটি বেশ তুচ্ছ কিন্তু কৌতূহলজনক। কুল, কম্ম আর সিপ্প (কুল, কর্ম ও শিল্প) অনুসারে সমাজভুক্ত মানুষকে কিভাবে স্তরবিন্যস্ত করা হত, তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ-ধর্মের আদি পর্বের সামাজিক প্রেক্ষা-পট। "সঙ্ঘে"র উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লেখিকা প্রধান ভিক্ষুরা সমাজের কোন্ কোন্ স্তর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার পরিচয় দিয়েছেন। এর পর পাই প্রধান ভিক্ষুদের এবং বুদ্ধদেবের মুখ্য 'গহপতি' অনুগামীদের পরিচিতি। ক্ষত্রিয়সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলির সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় রাজ-ধর্ম বিষয়ে বৌদ্ধদের ধারণা। রাজার সার্বভৌমক্ষমতাকে বলা হয়েছে বিশেষ-ভাবে সপ্তরত্নের উপর নির্ভরশীল। এরা হল—চক্করত্ন, হত্থীরত্ন, অস্সরত্ন, মণিরত্ন, ইত্থীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং পরিণায়করত্ন (অর্থাৎ উপদেষ্টামণ্ডলী)। সপ্তরত্নের পরিচয় দানের পর "চক্কবত্তি ধাম্-মিকো ধম্মরাজা" উক্তিটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন লেখিকা।

সমাপ্তি অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বাদি নির্দেশ করা হয়েছে।

পরিশিষ্টগুলিও মূল্যবান। বিশেষত শব্দকোষ অংশটি দামি। লেখিকা সহায়ক গ্রন্থের তালিকাও দিয়েছেন। এ ছাড়া রয়েছে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা অংশ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলো-চনা প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বহু বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দিক বিষয়ে আলোক-পাত করেছেন। কিন্তু অনতিদীর্ঘ পরিসরে বৌদ্ধধর্মের সামাজিক প্রেক্ষাপট এই প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে উন্মোচিত হল।

বিভিন্ন পালিগ্রন্থ থেকে লেখিকা অধ্যবসায়সহকারে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। সমস্ত উপাদান সুন্দরভাবে পরীক্ষিত এবং বিন্যস্ত হয়েছে। তিনি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণপদ্ধতির সঙ্গেও সুপরিচিত। তাঁর কয়েকটি বিশ্লেষণ, বিশেষত আধুনিক সমাজের সঙ্গে তুলনাক্রমে যা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তা বেশ চিত্তাকর্ষী।

বুদ্ধদেব যে সমাজে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তা সুবিদিত। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনার সময় সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। লেখিকা দেখিয়েছেন, বুদ্ধদেব অনেক বিষয়ে রক্ষণশীল ছিলেন এবং তৎকাল-প্রচলিত রীতি এবং সংস্কারকে লঙ্ঘন করেন নি। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী অনেকদিন আগে একটি লেখায় বলেছিলেন, বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রমাচারভাঙা পতিতপাবন সোসিয়ালিস্ট ছিলেন না। তাঁর সতর্কবাণী সর্বদা স্মরণ রাখার যোগ্য। শ্রীমতী চক্রবর্তী আলোচনায় স্থিরবুদ্ধি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এ গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ভারতীয় সমাজবিদ্যা বিষয়ে আগ্রহী সকল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থের মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জা অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের উন্নত মান বজায় রেখেছে। দাম কিছু কম হলে সাধারণ ক্রেতা উপকৃত হতেন।

রণেন্দ্রনাথ দেব

অনুবাদে ইউরোপীয় কথাসাহিত্য

'In this war the death-throes of the nation have commenced. Suddenly, all its mechanism going mad, it has begun the dance of the Furies, scattering its own limbs, scattering them into the dust. '

Nationalism গ্রন্থে অন্ধ জাতিবিদ্বেষের প্রতি এরকম ধিক্কার আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীর তলপিবাহক পত্রপত্রিকার উষ্মার উদ্রেক করেছিল। তাদের আতঙ্ক 'Such sickly sacherine mental poison with which that Tagore would corrupt the minds of the youth of our great United States।' এই আতঙ্ক সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যুবকদের মন থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে, বৃহৎ মানব-ভবিষ্যতের জন্য ভাবনার প্রবাহ স্তব্ধ করা যায় নি। যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেনচে-ট্রেনচে রবীন্দ্রনাথের এই বইয়ের ফরাসি ভাষায় অনূদিত টাইপ-কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হত। এরিখ মারিয়া রেমার্ক যখন প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর হাতে *Nationalism*-এর এরকম টাইপ-কপি পৌঁছেছিল কিনা, এসব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু রেমার্কের নায়ক জারমান সৈনিক পল বমার রক্তাক্ত খুনি হাত বাড়িয়ে নিহত ফরাসি সৈনিকের উদ্দেশে যখন কেঁদে ওঠে, 'কমরেড, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই নি। তুমি যদি আবার এখানে লাফিয়ে পড় আমি তোমাকে হত্যা করব না,···আমি দেখেছি যে তুমিও আমার মতন একজন মানুষ। ···এখন আমি তোমার স্ত্রী, তোমার মুখমণ্ডল এবং তোমার সাথিত্ব দেখতে পাচ্ছি। কমরেড, আমায় ক্ষমা করো' (পৃ ১৯২) তখন অন্ধ জাতিবিদ্বেষের দানবীয় চিৎকার অপেক্ষা শাশ্বত মানবসত্যের মধুর সংগীতধ্বনি শান্তির পক্ষে সংগ্রামে সকল দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলে।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯১৮ সালে। জারমান পক্ষের সৈনিকরূপে এরিখ মারিয়া রেমার্কের অভিজ্ঞতার স্মারক ১৯২৯ সালে জারমান ভাষায় প্রকাশিত হয় *In Weten Nichts Neues / All Quiet on the Western Front* / "পশ্চিম সীমান্ত শান্ত নিঝুম" উপন্যাসটি। কিন্তু মানবতার শত্রু, ফ্যাসিসট শক্তি তাঁকে ক্ষমা করে নি। ১৯৩৮ সালে হিটলার-কর্তৃক চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের পর সূচিত হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের "কালঝঞ্ঝা-ঝঙ্কারিত দুর্যোগ আঁধার।" ১৯৩৯ সালে ভস্মীভূত করা হল রেমার্কের বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থ, নির্বাসিত হলেন রেমার্ক স্বদেশ থেকে। কিন্তু মানবাত্মার পক্ষে রেমার্কের সংগ্রাম মিথ্যা হয় নি। পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে *In Weten Nichts Neues*, বহু-দেশের মানুষ রেমার্কের সঙ্গে রাইফেল হাতে নিয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করেছে, 'তোমার মায়েরাও আমাদের মায়ের মতো উদ্বিগ্ন। আমাদের একই মৃত্যু-ভয় আছে, মৃত্যু আছে, যন্ত্রণা আছে। ···তুমি আমার শত্রু হবে কেমন করে? এই রাইফেল আর উর্দি ফেলে দিলে তুমিও···আমার বন্ধু হবে।'

আবদুল হাফিজ এক মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন। তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য এখনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিংস্র নখদণ্ডে মানবাত্মাকে ছিন্নভিন্ন করতে তার আয়োজন প্রখর রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী অভিযাত্রীদের যাত্রা এখনো বিশ্রাম-স্থলে উপনীত হয় নি। রেমার্কের এই উপন্যাস তো শুধু একটা উপন্যাস নয়, যুদ্ধবাজের বিরুদ্ধে শান্তিসংগ্রামী অভিযাত্রীদের শাণিত তরবারি। হাফিজ এক মাহেন্দ্রক্ষণে এই গ্রন্থ অনুবাদ করে শান্তির পক্ষে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত রাখতে সাহায্য করলেন।

বাংলাদেশে আবদুল হাফিজ এই উপন্যাসের অনুবাদে পথিকৃৎ। পশ্চিম-বঙ্গে এর সর্বপ্রথম অনুবাদ হয়েছিল বোধহয় চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। বাঙলা ভাষায় হাফিজ সর্বপ্রথম নন, কিন্তু সর্বোত্তম—প্রয়াসে তিনি সজীব।

অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট—এরিখ মারিয়া রেমার্ক / আবদুল হাফিজ। মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮৭। ৬৫/৪৫ টাকা।

প্রত্যাগত—এরিখ মারিয়া রেমার্ক / আবদুল হাফিজ। মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮৭। ৭০/৫০ টাকা।

প্রথম জীবনের গল্প—মিখাইল শলোখভ। খালিকুজ্জমান ইলিয়াস। মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮৬। ৪৫/৩০ টাকা।

রাশিয়ার গল্প—মুস্তাফিজুর রহমান। মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮৬। ২৮/১৮ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে অনূদিত গ্রন্থটি 'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ'। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মূল রস-প্রবাহের বাধাকে এড়ানো যায় না। হাফিজ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চান নি। ইংরেজি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ রূপ অক্ষুণ্ণ রাখতে যত্নবান থেকেছেন। আর সেই কারণেই বাঙলাভাষাভাষীর কাছে তাঁর গ্রন্থটি নবীনতম না হলেও অভিনব।

বাঙলা অনুবাদভাণ্ডারে গদ্যে-পদ্যে পূর্বসূরীরা যে সম্পদ রেখে গেছেন, তাতে অভিযোজনটি চেনা যায়, কিন্তু অনুবাদের সর্বজনস্বীকৃত মান বেছে নেওয়া বোধহয় দুষ্কর। সার্থক অনুবাদ বিষয়ে বিদগ্ধজনে মতৈক্য যে খুব পোক্ত হয়ে উঠেছে, এমন মনে হয় না। পদ্যের অনুবাদের প্রণালী একরকম, গদ্যের প্রণালী ভিন্ন। পদ্যে সমস্যা—কবিতার ভাব উদ্রেক করা। গদ্যের ক্ষেত্রেও সমস্যা অনুবাদককে কম আতান্তরে ফেলে না। রসসাহিত্যের গদ্য তো শুধু বর্ণনা নয়। ভাষান্তরে ভাষারই প্রতাপ সমধিক, কিন্তু ভাবের সৌন্দর্যস্ফুরণের দায়িত্বকে কি অস্বীকার করা যায়? তবে সমঝাওতা একটা আছে - that translation is the best which comes nearest to creating in its audience the same impression as was made by the original on its contemporaries.

হাফিজের কাছে এসব সমস্যা নিশ্চয়ই ছিল। হাফিজ উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিজের ভাষায় পরের ভাষার অনুবাদে তিনি রসের স্বাদ পরিবেশন করতে ব্যর্থ হন নি। মূল গ্রন্থ (ইংরেজি) থেকে কিছু অংশ নিয়ে অধ্যবসায়ী পাঠক যদি তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হতে চান তবে, বোধহয়, অতৃপ্তির বেদনা তাঁকে ভোগ করতে হবে না। তিনি ইংরেজি গদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন, আবার বাঙলা গদ্যের প্রকৃতির অনুস্মৃতি থেকে দূরতম কোণে অবস্থান করেন নি। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ইংরেজি আর বাঙলার পার্থক্য বিষয়ে তাঁর সচেতনতা অনুবাদের স্বচ্ছন্দ গতিকে অব্যাহত রেখেছে। শব্দপ্রয়োগে হাফিজের সযত্ন আর সতর্ক দৃষ্টি মূলের রসকে যেমন প্রবহমান রেখেছে, তেমনি স্বকীয় সৌন্দর্যকে বিধ্বস্ত করে নি। এরকম দৃষ্টান্তের প্রভা বিচ্ছুরিত অনেক অনুচ্ছেদেই। এর সমর্থনে অধ্যবসায়ী পাঠক ৫৩ পৃষ্ঠার ৪র্থ অনুচ্ছেদে 'ওগো ধরিত্রী মাতা···'ইত্যাদি অংশ দেখে নিতে পারেন।

তবে, এই সচেতনতা, সযত্ন এবং সতর্ক দৃষ্টি সর্বদাই সচল থেকেছে এমন নয়। মাঝে-মধ্যেই কিন্তু পীড়া-উদ্রেকের কারণ হয়ে উঠেছে। যেমন ১০৭ পৃষ্ঠার ১২ লাইন 'সে আকাঙ্ক্ষাগুলো পাওয়ার অতীত···' ইত্যাদি। বাঙলাভাষায় কেমন যেন অচল। ক্রিয়াপদের আধিক্য কোনো বর্ণনায় এনেছে একঘেয়েমি। এসবের উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায় ১০৩ পৃষ্ঠার ৩য় অনুচ্ছেদটি, 'সব জায়গায় তার কাটা হচ্ছে···পড়ে যাই···' ইত্যাদি অংশ। হাফিজ বোধহয় বাঙলা ক্রিয়াপদের ঠাঁইবদলের রীতিটি বিশেষ বিবেচনা করে দেখেন নি। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার পারম্পর্যবিধি মান্য করেও শুধু বৈচিত্র্যের জন্য নয়, অপর ভাষার অনুবাদের স্বচ্ছরূপটি আপন ভাষায় পরিস্ফুটনের জন্য ক্রিয়াপদের ঠাঁইবদল আবশ্যক হয়ে পড়ে। মূলের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্য কখনো-কখনো অর্থহীন বাক্যেরও দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। যেমন, ১৭ পৃষ্ঠার 'কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিয়মানুবর্তিতাপ্রিয়" ইত্যাদি। এসব অসতর্কতা সত্ত্বেও হাফিজ ভালো অনুবাদ করেছেন।

আবদুল হাফিজের আর-একটি মূল্যবান সংযোজন রেমার্কের অপর উপন্যাস *Der Weg Zeriick* এর ইংরেজি *The Road Back*-এর বাঙলা অনুবাদ "প্রত্যাগত"। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্বে রেমার্কের '*Three Comrades*'-এর অনুবাদ হয়েছিল। বাঙলা ভাষায় *The Road Back*-এর অনুবাদে হাফিজই সর্বপ্রথম। পরিচয়সূত্রে অনুবাদক যথার্থই উল্লেখ করেছেন, '*The Road Back* উপন্যাস *All Quiet on the Western Front*-এর অনুক্রম।' ১৯৩১ সালে *The Road Back* গ্রন্থটি প্রকাশ লাভের পর সংবর্ধিত হয়েছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে সংগ্রামী অভিযাত্রীদের দ্বারা। এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় যুদ্ধপ্রত্যাগত তরুণ সৈন্যদের জীবনের ট্রাজেডি। এই ট্রাজেডি-সূত্রেই যুদ্ধবিধ্বস্ত জারমানির লোকসাধারণ আর উচ্চবর্গীয়দের জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন রেমার্ক। আর, আভাসিত করেছেন উগ্র জাতিপ্রেমে যে ফ্যাসিসট শক্তি দানা বাঁধে তার ক্ষীণ রেখা।

হাফিজ "প্রত্যাগতে" সার্থকতায় পৌঁছেছেন বিষয় অনুসারে গদ্যের গঠনের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতায়। বিষয় অনুসারে গদ্যের পার্থক্য সকল ভাষার গদ্যসাধকদের মেনে নিতে হয়। *All Quiet on the Western Front* আর *The Road Back* উভয়ই উপন্যাস বটে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রভূত। এই পার্থক্য রেমার্ক রেখে

গেছেন। ইংরেজি অনুবাদককেও নিঃসন্দেহে তা মেনে নিতে হয়েছে। হাফিজ দুই উপন্যাসের ভিন্নতার মরজিটুকু এক হয়ে উঠতে দেন নি। "অল কোয়ায়েট" অপেক্ষা "দ্য রোড ব্যাক"-এর গতিবেগ বড়ো ধীর। আকস্মিকতা আর দুর্ভাগ্যের চমক স্বল্প। এখানে নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহ। খাওয়া-পরার মতোই নিষ্প্রভ অনুজ্জ্বল। তদুপরি তত্ত্বভারে ভারাক্রান্ত। অথচ "দ্য রোড ব্যাক"-এর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির উত্তাপ "প্রত্যাগতে" যদি সঞ্চারিত না করা যায় তবে অনুবাদকের সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে পড়ে! "অল কোয়ায়েট"-এ শব্দব্যবহারে তিনি অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, শব্দের বিবিধ গুণকে তিনি যে আয়ত্তে এনেছেন বিশেষ-বিশেষ সংলাপে, দৃশ্যবর্ণনায় তার স্বাক্ষর রয়েছে। হয়তো 'every peculiarity of the original'কে তিনি রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু পরভাষার বিশেষ রূপটুকু মাতৃভাষায় উজ্জ্বল করে তুলতে দুর্বলতা লক্ষ করা যায় নি। এই বইটির বর্ণনাত্মক গদ্যের সৌন্দর্য গভীর কল্পনা আর অনুভূতির গভীরতায়। শব্দসংযোজনের প্রযত্নে হাফিজ 'প্রত্যাগতে' তা যথাযথ প্রবাহিত করেছেন। এই উপন্যাসের অনুবাদক হাফিজ যেন আরো যত্নশীল। বাক্যগঠনে, বাঙলা 'ইডিয়ম' সংযোজনায় সর্বদাই তাঁর রসবোধ সক্রিয়। ফলে হৃদয়াবেগের স্বাধীন স্ফূর্তিতে "প্রত্যাগত" হাফিজকে সার্থক অনুবাদকরূপে সুচিহ্নিত করেছে।

কোনো এক শ্রদ্ধেয় কবি এবং সাহিত্য-সমালোচক অনুবাদ প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন, 'বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্ট রচনা অনুবাদ করিতে হইলে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন;—সেই মূলভাষার শুধু শব্দার্থজ্ঞান নয়, তাহার ইডিয়মের রসবোধ; দ্বিতীয়,—যে ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে সেই ভাষার অনুরূপ ইডিয়ম যোজনা করিবার শক্তি…' খালিকুজ্জমান ইলিয়াসের মিখাইল শলোখভের প্রথম জীবনের গল্প প্রসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নির্দেশটি মনে এল। মিখাইল শলোখভ পৃথিবীর সকল সাহিত্যরসিকদের কাছে সুপরিচিত এবং বঙ্গভাষাভাষীর কাছেও তিনি অখ্যাত নন। শলোখভ 'মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মানবতা ও মানব-অগ্রগতির আদর্শের সক্রিয় যোদ্ধা হিসাবে' পাঠকের হৃদয় জাগ্রত হোক—এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষার বেগেই রুশ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে তিনি পৃথিবীর সভায় সমাদৃত। খালিকুজ্জমান শলোখভের যে ছয়টি গল্প বেছে নিয়েছেন সেগুলিতে রয়েছে রাশিয়ার বিপ্লবের পরবর্তী লেনিনের নেতৃত্বে নতুন জীবন গঠনের পালার কথা। নতুন সোভিয়েত গড়ার ইতিহাস জানার মূল্য আছে বই-কি! কিন্তু তার চেয়েও এই গল্পগুলির শ্রেষ্ঠত্ব মানবসত্যের প্রেমস্পর্শে। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত গঠনের উপকরণ নিঃসন্দেহে আমাদের উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের কাছে উপকরণ তুচ্ছ, যদি না মানবজীবনের অবিস্মরণীয় সংগীত তিনি পাঠকহৃদয়ে সঞ্চার করতে ব্যর্থ হন। শলোখভের পরিমণ্ডল আমাদের কাছে অপরিচিত। অথচ জীবনকে দেখার দুর্লভ দৃষ্টির সাহায্যে তিনি মানবসত্যকে আমাদের সমবেদনায় ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। সে কারণেই জন্মের দাগ, বেজন্মা, অশ্বশাবক, বেগানা আজও পৃথিবীর সাহিত্যে প্রাণবান এবং শলোখভ আমাদের কাছের মানুষ।

ইলিয়াস শলোখভের গল্পগুলির অনুবাদে ভাষার অপরিচয়, পরিমণ্ডলের অজ্ঞতা অতিক্রম করতে পেরেছেন। তা সম্ভব হয়েছে বিদেশী ভাষার শব্দার্থজ্ঞান এবং ইডিয়মের রসবোধে। মাতৃভাষার গদ্যপ্রকৃতির চলনও তাঁর করায়ত্ত। ফলে, ভাষাকে দুমড়ে-মুচড়ে সমস্ত গল্পগুলিকে একেবারে বাঙলা সাহিত্যভাণ্ডারের একান্ত ধন করে তুলেছেন। এটা অনুবাদকের কৃতিত্ব। পদে-পদে শব্দ বা বাক্যের অনুসরণ যথেষ্ট নয়। মূল ভাব বাঙলা ভাষায় কিভাবে প্রবাহিত করা যায় সে বিষয়ে তিনি সৃজনধর্মী অধ্যয়নের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাঙলা গদ্যছন্দের স্পন্দনকে সার্থক শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে ধ্বনিত করে শলোখভের সম্পদকে স্পর্শ করার সুযোগদানে তিনি আমাদের তৃপ্ত করেছেন।

মাঝে-মধ্যেই কশাক শত্রুদলের কিংবা রুশ সৈন্যদলের সংলাপে উর্দু এনেছেন। এর যৌক্তিকতা যাথার্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা, এসব প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচ্য। কিন্তু সংলাপের এই বৈচিত্র্য গল্পের গতিকে প্রাণবন্ত করেছে, সে কথা বলতেই হয়। ইলিয়াসের সার্থকতা স্বকীয় সৌন্দর্যদানে।

'রাশিয়ার গল্প' অনুবাদ করেছেন মুস্তাফিজুর রহমান। মোট ছয়টি গল্পের মধ্যে খালিকুজ্জমান ইলিয়াস অনূদিত শলোখভের 'বেজন্মা' ও 'অশ্বশাবক' গল্প দুটি তিনি 'জারজ' ও 'ঘোড়ার বাচ্চা' নামে অনুবাদ করেছেন। এর

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ম্যাকসিম গোরকির দুটি গল্প এবং উজবেক লেখক উতকুর খাসিমত এবং তাতার লেখক রুস্তম কুতুইয়ের একটি করে গল্প। 'ভূমিকা'য় লেখক ও গল্পপরিচয় প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 'বাংলাদেশের কোনো অনুবাদকের হাতে এঁদের ছোটগল্পের অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হল।' মুস্তাফিজুর বাংলাদেশের কৃতী অনুবাদক। জানা গেল, পনেরো বছরে তিনি ইউরোপীয় ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদে মুস্তাফিজুর স্বচ্ছন্দ। ভাষা নিঃসন্দেহে সহজ সরল। কিন্তু স্বকীয় রসসৌন্দর্যকে বিস্ফারিত করার আয়োজন বড়ো স্বল্প। যেন বিষয়কে অনুবাদ করা অপেক্ষা ভাবকে অনূদিত করার দিকে তার ঝোঁক একটু বেশি মাত্রায় লক্ষ করা গেল। ফলে বিদেশী গন্ধ সর্বত্র এড়ানো সম্ভব হয় নি। সৃজনধর্মী রসসাহিত্যে ভাষা শুধু বর্ণনা দেয় না, ভাব-উদ্রেকের আয়োজন করে। পরভাষা থেকে এই ভাব মাতৃভাষার মাধ্যমে উদ্রেকের জন্য নিত্য-প্রয়োজনের অতীত সর্বজনীনত্বকে আশ্রয় করতে হয়। সব কথা স্পষ্ট অর্থবহ হলেও সার্থকতা অর্জন করা যায় না। বর্ণহীন, বেগহীন, ব্যঞ্জনাহীন নিত্যপ্রয়োজনের ভাষায় শিল্প-জ্যোৎস্নার স্পর্শ আবশ্যক। মুস্তাফিজুর রহমানের গল্প-নির্বাচন যথার্থ, অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তাঁর উদ্যানে পুষ্পের সৌরভ মাতিয়ে তোলে না।

কান্তি গুপ্ত

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনা পশ্চিমী দুনিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু কিছুদিন আগেও বাঙলা ভাষায় এ ধরনের প্রয়াস গবেষণার মর্যাদা পেত না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রবন্ধ লেখা হলেও বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং বিশালত্বের তুলনায় তা নগণ্য। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ড. নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র" নিঃসন্দেহে এক প্রয়োজনীয় রচনাকর্ম। বাঙলা চলচ্চিত্রের স্বার্থেই এ ধরনের অ্যাকাডেমিক চর্চাকে স্বাগত জানানো উচিত।

গ্রন্থের নাম "বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র" হলেও সেলুলয়েড-জগতের বহুবিধ প্রসঙ্গের উপরই আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন লেখক। বাঙলা চলচ্চিত্রের নির্বাক এবং সবাক যুগের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে। প্রথম খণ্ডে আলোচনার সীমারেখা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বাঙলা চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ সম্পর্কিত বিতর্কিত প্রশ্ন, চলচ্চিত্রের আবিষ্কার, বাঙলা চলচ্চিত্রের সূচনাকালে বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, রঙ্গমঞ্চ, বাঙলা কথাসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়েরও উত্থাপন করেছেন লেখক। এ সবই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রীমুখোপাধ্যায় তথ্য এবং উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছেন ব্যাপকভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সম্ভবত উপস্থাপনার দোষেই বহু ক্ষেত্রেই লেখকের বক্তব্যকে কিছুটা আরোপিত বলে মনে হয়। বিশ্লেষণের অভাব ওইসব ক্ষেত্রে যুক্তির যথার্থ অভিব্যক্তিকে বিকশিত হতে দেয় না। ভূমিকা অংশে শ্রীমুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন চলচ্চিত্রের শৈল্পিক গুণাগুণ নিয়ে। চলচ্চিত্র শিল্প কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আজও চলেছে। লেখকের মনে চলচ্চিত্রের শিল্পসত্তা সম্পর্কে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে H.P. Manoogain এবং সত্যজিৎ রায়ের দুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির পরে কোনো রকম মৌলিক বিশ্লেষণ ছাড়াই উনি লেখেন,—'অন্যান্য শিল্পের মতই চলচ্চিত্র বিশেষ ধরনের শিল্প।' (পৃ ৩); বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয় লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণকে পরিপুষ্ট করবার তাগিদে। এক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে—যেটুকু আছে তাতে ঘনত্বের চেয়ে বিক্ষিপ্ততাই বেশি। সত্যজিৎ রায় বা Manoogain-এর মন্তব্য নিশ্চয়ই মূল্যবান; কিন্তু এ-রকমও মনে করা ঠিক নয় যে, যেহেতু সত্যজিৎ রায়, Manoogain, আইজেনস্টাইন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চলচ্চিত্রকে শিল্প বলে মনে করেন, সেই কারণেই এটি একটি শিল্প। চলচ্চিত্র যদি শিল্প হয়, তবে তা নিজস্ব শৈল্পিক দাবিতেই। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের লেখায় উদ্ধৃতির বাহুল্য আছে, আছে উদাহরণের প্রাচুর্য। কিন্তু সর্বত্রই এসবের প্রয়োগ ঘটেছে এলোমেলো-

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র—ড. নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়। আনন্দধারা, কলকাতা। ১৯৮৬। পঞ্চাশ টাকা।

ভাবে। তিনশ চল্লিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের দুর্বলতা চোখে পড়ে।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ই এ বইয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করার নিরিখে বাঙলা সাহিত্যের বহু দিকপাল লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং চলচ্চিত্রায়িত গল্প, উপন্যাস আর নাটকের আলোচনা স্থান পেয়েছে এই তিনটি অধ্যায়ে। সম্ভবত এই অংশটিই আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। লেখকের অগাধ পাণ্ডিত্য আর প্রশংসনীয় অভিনিবেশ পাঠককে সাহায্য করে বাঙলা সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের একটি ক্ষুদ্র দর্পণের সামনে দাঁড়াতে। নিঃসন্দেহে এই অংশটি একজন চলচ্চিত্রামোদীর কাছে প্রয়োজনীয় অভিধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এখানেও, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে, লেখকের উপস্থাপনা অতি-সরলীকরণের দোষে দুষ্ট। যেমন ২০৬-৭ পৃষ্ঠায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে উনি লিখেছেন: 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর 'কালিন্দী' গণ-দেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'কবি' 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি উপন্যাসের তুলনা নেই।' এ ধরনের মন্তব্য যে-কোনো গবেষকের কাছেই পরিহার্য হওয়া উচিত। তারাশঙ্করের "দুই পুরুষ" নাটকের চিত্ররূপ সম্পর্কে লেখকের অভিমত—'ছবিখানিতে চিত্রনাট্যের ত্রুটি থাকলেও অন্যান্য দিক ভাল ছিল।' এহেন বাক্য বিষয়বস্তুর গুরুত্বকেই লঘু করে দেয়। অন্যান্য শিল্পের মতো চলচ্চিত্রেরও একটা নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব আছে। তারই আলোকে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ভালো-মন্দের বিচার। অবৈজ্ঞানিক, ব্যক্তিগত অভিমতকে এক্ষেত্রে পরিহার করাই সমীচীন।

চতুর্থ অধ্যায়ে চিত্রনাট্যের স্বরূপ, চিত্রনাট্যের সাহিত্যধর্মিতা এবং বাঙলা চিত্রনাট্য নিয়ে ছত্রিশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক দীর্ঘ আলোচনা পাঠককে আনন্দ দেয়। বেশ কিছু বাঙলা ছবির চিত্রনাট্যের অংশ তুলে ধরে তাদের সাহিত্যগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। এই অধ্যায়টি অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে যথাক্রমে বাঙলা চলচ্চিত্রে সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের টেকনিক আর বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা। দুটি অধ্যায়ই লেখকের পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করছে। গবেষকদের কাছে এই অধ্যায় দুটি সমাদর পেতে পারে।

"বাঙলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র" গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এর ইতিহাসমনস্কতা। বস্তুত এই একটি ক্ষেত্রেই শ্রীমুখোপাধ্যায় বহুলাংশে সফল। বাঙলা চলচ্চিত্রের সবাক এবং নির্বাক যুগ আর বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা চলচ্চিত্রের আন্তরীয়তার ইতিহাস হিসাবে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য। গ্রন্থপঞ্জী এবং সাহায্যকারী পত্রপত্রিকার তালিকা উৎসাহী পাঠকের জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করবে।

অভিজিৎ করগুপ্ত

"দুই সংস্কৃতি"—দুই মেরু?

মহাশ্বেতা চৌধুরী

ভিন্ন সমাজের ভিন্ন সংস্কৃতি নয়, এখানে আলোচ্য বিষয় একই সমাজে অন্য ধরনের এক পার্থক্যের কথা। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ এক বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলাফল আজ বৃহত্তর সমাজেও নানাভাবে অনুভব করা যাচ্ছে।

সমাজতত্ত্ববিদ সি. পি. স্নো তাঁর "টু কাল্‌চার্‌স্" রচনায় এই বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অনেক দিন আগে। ভারতে বিশেষ করে আজ এ বৈষম্য নানারকম সামাজিক পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের পর থেকেই, কিছুটা বেশি মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান পড়ার জন্য আগ্রহী হয়। শুধু তাই নয়, তাদের বাবা-মা, শিক্ষক—সবাই ধরে নেন তারা বিজ্ঞান / ইনজিনীয়ারিং / ডাক্তারি ইত্যাদি পড়বে। আগ্রহ যে অন্য ছাত্রছাত্রীদের থাকে না তা নয়, তবে কঠিন প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বযুদ্ধে তারা সহজেই হেরে যায়। বলাই বাহুল্য, এরকম মানসিকতা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ আর সদ্ব্যবহার করে ব্যবসায়িক শিক্ষণকেন্দ্রগুলি। আকাশের চাঁদ বা আঙুরফলের মতো দুর্লভ সাফল্যের চাবিকাঠিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিযোগীদের (এবং তাদের বাবা-মার) নাকের সামনে দুলিয়ে তারা অর্থসমাগমে ফুলেফেঁপে উঠছে। ভবিষ্যৎ পরীক্ষায় সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নানা "কোচিং সেনটার" সারা ভারত জুড়ে নানা পরীক্ষার জন্য পেশাগতভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রতিযোগিতা যে কত কঠিন তা বোঝা যায় এইসব সেনটারগুলির চাহিদা দেখে। বস্তুত, চাহিদা এত বেশি যে সব ইজুক শিক্ষার্থীই এই ধরনের কোনো কোনো পোসটাল কোচিং পেতে পারে না—তা পাওয়ার জন্যও আবার বোর্ডের পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিতে হবে। বলা বাহুল্য, চাহিদা যখন বেশি মূল্যও সেই অনুপাতে যথেষ্ট বেশি এ ধরনের কোরসের। মোটামুটি নামকরা দু-একটি টিউটোরিয়ালকে দিতে হয় প্রায় হাজার টাকা। প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে স্বল্পবিত্ত বাবা-মাও এই অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন সন্তানের 'উজ্জ্বল' ভবিষ্যতের কথা ভেবে। চাহিদার ফলে এখানেও অন্য ক্ষেত্রের মতো কালোবাজারি চলে। যে মেধাবী ছাত্র এই দুর্লভ সম্মানের সুযোগ পায়, তার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেধাবী, (তা না বলে 'কম নমবর পাওয়া' বলাই ভালো, কারণ তাই দিয়েই তো আমাদের 'মেধা' বিবেচিত হয়) ছাত্র নোট্‌স্ আর সম্ভাব্য প্রশ্নাদি নিয়ে ভরতির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। কিছু অর্থও হয়তো দিতে হয় তাদের। শুধু বোর্ডের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিই নয়, সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক কারিগরি শিক্ষার কলেজগুলিতে ভরতি হওয়ার চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রী আর তাদের অভিভাবকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর অন্যান্য ঝামেলায় প্রাণান্তকর অবস্থার সম্মুখীন হন। বরং বোর্ডের পরীক্ষায় খুব ভালো না করতে পারলে এই কঠিনতর সংগ্রাম থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মাঝামাঝি মেধাবী ছাত্রদের আবার আরো যন্ত্রণাকর অবস্থা। যেহেতু বোর্ডের ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতায় অনেকেই আস্থা কম, এবং সমাজে ওপরতলায় ওঠার সিঁড়ির সন্ধান (অন্তত কিছু লোকের মতে) এইসব কলেজে ভরতি হলে সহজে মেলে, মাঝারি ছেলেমেয়েরাও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ

প্রতিযোগিতার দৌড়ে নেমে পড়ে। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে তারা হিমশিম খায়, বার-বার বন্ধ দরজায় মাথা ঠোকে, কঠোর পরিশ্রম আর উত্তেজনার চাপে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসাফল্যের হতাশায় তাদের মনোবল যায় ভেঙে। অকারণ হীনম্মন্যতায় ভোগে তারা। এমন অবস্থায় অন্যান্য সামাজিক ব্যাধিরও শিকার হতে পারে সহজে।

ডিগ্রীর দিকে রুদ্ধশ্বাস দৌড়

বিরাট ছাত্রসমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ তাহলে সুযোগ পায় (মেধা, পরিশ্রম ও ভাগ্যের জোরে) কারিগরি বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান বিভাগে। প্রতিযোগিতার কাঠিন্য দিয়ে ছাত্রদের একরকম সামাজিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়। প্রথম সারিতে আছে সর্বভারতীয় বিজ্ঞান আর কারিগরি কলেজগুলি, তারপর আঞ্চলিক কারিগরি আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের কলেজগুলি, তারপর অন্যান্য কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ। এই হল মোটামুটি সাধারণ ছবি। ব্যতিক্রম অতি দুর্লভ।

এ তো গেল সংখ্যালঘিষ্ঠ একাংশের কথা। আর বোর্ড

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিরাট এক ছাত্রজনসংখ্যার স্থান কোথায়? অন্যান্য দেশেও অবশ্য বেশির ভাগ হাই-স্কুল-উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীই উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজে যায় না; বিভিন্ন পেশায়, অফিসে, ব্যাঙ্কে কাজ নেয়। কেউ-কেউ আবার পরে সুযোগ করে লেখাপড়ায় ফিরে যায় বা কিছুদিন কাজ ছেড়ে বা ছুটি নিয়ে ডিগ্রী করে। তবে আমাদের দেশের ডিগ্রীর পেছনে দৌড়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। চাকরির অভাব, সামাজিক মর্যাদাবোধ—নানা কারণে বোর্ড পরীক্ষায় পাশ করলে প্রায় সবাই চেষ্টা করে অন্তত প্রথম ডিগ্রীটা পাবার। তার ফলে আনডারগ্র্যাজুয়েট কলেজগুলিতে ভরতি হওয়ার হুড়োহুড়িও কোনো অংশে কম নয়। এখানেও বিজ্ঞান বিষয়গুলিই প্রথম প্রাধান্য পায়। নামী কলেজগুলিতে পর্যন্ত বিজ্ঞানশাখার জন্য ন্যূনতম মান (নমবর দিয়েই প্রাথমিক নির্বাচন) কলা-বিষয়ের চেয়ে সব সময়েই বেশি চাওয়া হয়। তা ছাড়া আছে কলেজগুলির নিজস্ব নির্বাচনী পরীক্ষা। আরো বৈষম্যমূলক একটি নিয়ম কাজ করে। সেটি হল: বিজ্ঞান-শাখার ছাত্র কলাবিভাগের স্নাতকশ্রেণীতে ভরতি হতে পারে, কিন্তু কলাবিভাগের ছাত্র বিজ্ঞানে যেতে পারে না। বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষণ এবং অঙ্কে ব্যুৎপত্তির প্রয়োজনই এর কারণ। কিন্তু একইভাবে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওই শাখায় ভর্তি হতে না পেরে) কলাবিভাগে ভরতি করার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ার জন্য কোনো প্রাক-স্নাতক শিক্ষণ দরকার হয় না নাকি শুধুই ছাত্রসংখ্যা বাড়াবার জন্য?

নির্বাচনের চালুনি দিয়ে বারবার ছাঁকার পর তাহলে যারা কলেজ এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে) ভিড় জমায়, তাদের মধ্যে বিভিন্ন কলাবিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। এই নিয়ম নানা সামাজিক কারণে ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কারণ কিছু মেধাবী মেয়ে এখনো কারিগরি / চিকিৎসা / বিজ্ঞানের দিকে না গিয়ে সাহিত্য/ দর্শন / সমাজতত্ত্ব / রাষ্ট্রতত্ত্বর দিকে আসে।

শুরুতেই স্ট্রীমিং

স্কুল শেষ করে উচ্চতর শিক্ষা শুরুর সময়েই এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন যাত্রা। গোড়াপত্তন অবশ্য মাধ্যমিক স্তর থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু অতি-উৎসাহী "টিউটোরিয়াল" প্রতিষ্ঠান আবার অতিসচেতন অভিভাবকদের মেধাসম্পন্ন সন্তানদের নবম-দশম শ্রেণী থেকেই স্কুলপরীক্ষায় যোগ্যতার ভিত্তিতে কারিগরি / চিকিৎসা ইত্যাদি কলেজে যাবার জন্য তৈরি করে। এতে তেরো-চোদ্দো বছরের তরুণ দেহমনের ওপর চাপ সৃষ্টি তো হয়ই, তা ছাড়া এক ধরনের পার্থক্য গড়ে ওঠে অন্যদের সঙ্গে। ইংল্যান্ডে ১১+ বয়সে 'স্ট্রীমিং'-এর বিরুদ্ধে নানা বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই পদ্ধতির বদলে ষোলো বছর পর্যন্ত এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থাই বেশি বাঞ্ছনীয় বলে গৃহীত হয়েছে। সমালোচনার একটি প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে হীনম্মন্যতা আর পণ্ডিতম্মন্যতা দেখা দিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই বেসরকারি স্ট্রীমিংও অহরহ জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। অঙ্ক আর বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যুৎপত্তি না থাকলেও যে কারো সাধারণ বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট উঁচুদরের হতে পারে, এ তত্ত্ব অবহেলিত হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, প্রতিভা আর মেধা যদি বিজ্ঞানশিক্ষায় (পূর্বে বর্ণিত সবরকম বিষয়গুলি অন্তরভুক্ত করে) চলে যায়, তাহলে ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি রইল ছাত্রসমাজের অবশিষ্টাংশের জন্য—বুদ্ধি-মেধার পরীক্ষায় যাদের এ পর্যন্ত তলানি বলা চলে? অর্থনীতি বিষয় হিসেবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এর চাহিদা বেশি বলে কিছু মাঝারি ভালো ছাত্র এখনও যায় সেখানে। অবশিষ্টাংশ বলতেও সংখ্যায় এই ছাত্ররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কলেজে ভিড় জমায় তারাই, আবার পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও। প্রাথমিক এবং অন্যান্য স্তরের বিভিন্ন স্কুলে এবং কিছু-কিছু বেসরকারি কলেজে পড়ার খরচ অনেক বেড়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে মাসিক দেয় মাইনে হাস্যকর রকমের কম। ফলে মাসে ১২/১৫ টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ভিড় জমায় এমন অনেক তরুণতরুণীই যাদের আগ্রহ পড়াশুনায় নয়—অন্যত্র। এতে নানা সুবিধা ভোগ করা যায়, বন্ধুবান্ধব জোটে, এবং অবশ্যই রাজনৈতিক কাজ-কর্মেরও সুবিধা হয়। ভিড় জমানো যে শুধুই অবাঞ্ছিত তাও নয়। বহু বিভাগে ছাত্রছাত্রী আসার জন্য শিক্ষকরাও উৎসাহ দেন। কিছু ভালো ছাত্র না থাকলে পড়ানো হবে

কাকে? স্নাতকোত্তর শ্রেণীর আকর্ষণ এত বেশি যে আর কিছুতে না হোক অন্তত আইন বিভাগে নাম লিখিয়ে বসে বহু ছাত্র শুধুমাত্র 'কিছু করা'র তাগিদে।

দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে উদ্যোগ আর উৎসাহ বাড়ার জন্য ইদানীং কমার্স, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির দিকে যাবার ঝোঁকও হয়েছে কিছু ছাত্রের এবং তাদের অভিভাবকদের। তবে আগে যে মানসিকতার কথা বলেছি, এখানেও তা বহাল। প্রথম সারির ছাত্ররা বিজ্ঞানেই যেতে চায়—কমার্সে নয়, যতই তার জাতবদল হোক।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (১০+২) থেকে এই যে দুই ভিন্নমুখী যাত্রা, এর স্বরূপ আর ফলাফল কী? প্রথমে দেখা যাক সংখ্যাগরিষ্ঠ কলাবিভাগের ছাত্রদল, যারা বিজ্ঞানে যেতে পারে নি, তাদের ব্যাপারটি। যেতে পারে নি বলছি কেন না বেশির ভাগ ছাত্রই এ স্তরে নিজের পছন্দে নয়, বাধ্য হয়ে এসেছে। পরীক্ষার ফল বেরোবার জন্য অপেক্ষা করছে, এমন ছাত্রকে কী পড়বে জিজ্ঞেস করায় বলতে শুনেছি, 'জানি না, রেজালটের ওপর নির্ভর করছে'। অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো করলে, 'চান্স' পেলে সে দর্শন পড়বে না, পড়বে না ইতিহাস কি ভাষা-সাহিত্য।

এ রোগ হাল আমলের

এ ছবি কিন্তু খুব পুরনো নয়। পঁচিশ বছর আগেও প্রথম সারির ছেলেমেয়েরা (পরীক্ষার ভিত্তিতেই বলছি) ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি পড়েছে। তেমনি মাঝারি ছেলেরা গেছে কারিগরি বা বিজ্ঞানের দিকে। অর্থাৎ তখনো বিজ্ঞান আর কলার তফাত এমন প্রকটভাবে ছাত্রদের দ্বিধাবিভক্ত করে দেয় নি। সাধারণভাবে প্রতি-যোগিতার মনোভাব আজকের মতো তীব্রভাবে না থাকায় এই "দুই সংস্কৃতি" তখন এত গভীরভাবে ভিন্নধর্মী ছিল না। গুণগত মান, এবং তা রক্ষার সমস্যাও এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কলাবিভাগে আনুপাতিকভাবে মেয়েরা এখনো বেশি, তেমনি পেশাদার কলেজগুলিতে আজো মেয়েরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। মেধার পরীক্ষায় স্বীকৃতি পাওয়া পেশাদার কলেজের ছাত্ররা স্বভাবতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগী এবং ফলত নিজের উন্নতি তথা কলেজের শৃঙ্খলারক্ষায় যত্নশীল। অন্যদিকে পেছনে-ফেলে-আসা আনডারগ্র্যাজুয়েট কলেজভরা ছাত্রদল (তাদের মধ্যে আবার কলাবিভাগই সংখ্যাগরিষ্ঠ) নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত। লক্ষ্যহারা নৌকোর মতো গা ভাসিয়ে কলেজের বিরাট ক্লাসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে-খেতে তারা কয়েক বছর কাটিয়ে দেয়। স্থানাভাব, খেলাধুলোর ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। এইসব কারণে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসে শিক্ষা-দান-গ্রহণ চর্বিতচর্বণ ছাড়া কিছু হয় না। বরং এসব কলেজে বিজ্ঞান (আবার!) বিষয়ে ক্লাসগুলি ছোটো হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে অপেক্ষাকৃত ভালো, যদিও ল্যাবরেটরির দৈন্যদশা বহু জায়গাতেই লক্ষণীয়। তবু বিজ্ঞান বিষয়ে 'সীট নেই' শোনা যায়। এদের অনার্স ক্লাসগুলিতেও সীমিত সংখ্যায় ছাত্র নেওয়া হয়। কিন্তু কলাবিভাগে সংখ্যার কোনো সীমা নেই সেভাবে। কোনো-কোনো নামী কলেজে নমবর দেখা ও নির্বাচনী পরীক্ষা হয় অবশ্য, তবু তা বিজ্ঞানের নির্বাচনের মতো দুরূহ আর চূড়ান্ত নয়। একই কলেজে বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন যেখানে ন্যূনতম ৭০/৭৫ শতাংশ নমবর, সেখানে কলাবিভাগে শতকরা পঞ্চাশ পেয়েও সহজে ভরতি হওয়া যায়। ভরতি হওয়ার পর্যায়েই তাহলে প্রাথমিক এক শ্রেণীবিন্যাস ঘটে যায়। ফলে যদি কেউ ভালো (শতকরা ৭০/৮০ পেয়ে) ফল করেও স্বেচ্ছায় সাহিত্য কি ইতিহাস পড়তে যায়, তাহলে হয় তাকে লোকে মূর্খ বলবে, নয় তার 'ভালোত্ব'ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। নিছক ভরতির কাঠিন্য দিয়েই পণ্ডিতম্মন্যতা হীনম্মন্যতা গড়ে ওঠে। শুধু ছাত্রমহলেই যে তা নয়, শিক্ষকমহলেও 'low-prestige' 'high-prestige' কলেজের মতো বিভাগের মধ্যেও বৈষম্য—বহু সময়ে অন্যায় রকমের বৈষম্য—গড়ে ওঠে। চাহিদার সঙ্গে, সহজে-পাশকরা-যায় মানসিকতার সঙ্গে ক্লাসে ছাত্রসংখ্যার ওঠানামা নির্ভর করে। নাম না করেও বলা যায়, কলাবিভাগের সে রকম দু-একটি বিষয়ে ক্লাসে ছাত্র উপছে পড়ছে, এক-এক ক্লাসকে তিন-চারটি ভাগ করলেও তাতে একশর ওপর ছাত্র, অন্য-দিকে সংস্কৃতর মতো বিষয়ে ছাত্র নেই। বিদগ্ধ, নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সংস্কৃতের অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের নিজ বিষয়ের ক্লাস কম (বা নেই) বলে অন্য বিষয়ের ক্লাস বা টিউটোরিয়াল নিতে হচ্ছে—এ ঘটনা হামেশাই ঘটছে। পণ্ডিত হয়েও তাঁরা অন্য বিভাগগুলির সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে অকারণ দুর্বলতা বোধ করছেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার / প্রাতিষ্ঠানিক মান

আমাদের মতো বিপুলজনসংখ্যাবহুল দেশে নিছক সংখ্যাই অনেক ব্যাপারে নিয়ামক হয়ে ওঠে। তার ওপর গণতান্ত্রিক হওয়ার দাবিতে এবং অন্য সুযোগের অভাবে কলেজে ভরতি হওয়ার দরজা প্রায় অবারিতই রাখা হচ্ছে। শিক্ষা পাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক মান বিসর্জন দেওয়া যে এক নয়, সেই সূক্ষ্মরেখাটুকু বাস্তবের মোটা আঁচড়ে মুছে যেতে বসেছে। কোথাও-কোথাও ছাত্র ইউনিয়নের হুকুমেও ছাত্র ভরতি করতে হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে শিক্ষক-অধ্যক্ষের মনোনয়নই চূড়ান্ত —এ তত্ত্ব শুধু যে বিপুল ছাত্রজনতাই ভুলে যেতে বসেছে তা নয়, শিক্ষক-অধ্যক্ষরাও অজান্তে নানা তাগিদে ভরতির দরজা যতটা সম্ভব (জনসাধারণের জন্য) খোলা রাখছেন। আমাদের সরকারি নিয়মকানুনও তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। দুটি নিয়ম দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান নিয়মে অধ্যক্ষের জন্য দুটি বেতনক্রম করা হয়েছে ছাত্রসংখ্যার ভিত্তিতে। বলাই বাহুল্য, উচ্চতর স্কেলটি পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষেরা কেনই বা ছাত্রসংখ্যা বাড়াবেন না? এই নিয়মটি বদলে কি কলেজের গুণগত মান (না হয় ওই নমবরের ভিত্তিতেই), যেমন সাফল্যের দশ বছরের গড়পড়তা হিসাব, বা অন্যকিছু—যেমন অধ্যক্ষের যোগ্যতা ইত্যাদি—দিয়ে করা যেত না? আর-একটি নিয়ম হল ছাত্রসংখ্যা একটি বিশেষ পর্যায়ে বাড়লে অফিসে একটি বাড়তি পোস্ট পাওয়া যায়। তাহলে ছাত্রসংখ্যা যে মূল্যেই হোক বাড়লে অনেকেরই সুবিধা।

এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সবার পাওয়া উচিত নয়। উপরোক্ত সমস্যাগুলি অবতারণার যুক্তি হল এই যে শুধুমাত্র সংখ্যায় বিপুল ছাত্রজনতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার স্থান, সুযোগ সুবিধা, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, হসটেল—কোনো কিছুই পর্যাপ্ত নয় এইসব পেছনের সারির কলেজগুলোতে (ব্যতিক্রম কিছু অবাঙালি প্রতিষ্ঠান আর ধর্মীয় সংস্থার কলেজগুলি। তবে সংখ্যায় তারা নগণ্য)। আমাদের পূর্বোক্ত বিবরণে দেখা গেছে, এরা প্রতিযোগিতার দৌড়ে 'অলসো র‍্যান'-এর দল। কলেজগুলির স্থানাভাব, প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর ক্যানটিন, ভিড়-গোলমালভরা আবহাওয়া, অর্ধপক রাজনীতির প্রভাব সামাজিক অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি করতে পারে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বেশি বলেও পড়াশুনোর অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং কারিগরি বিজ্ঞানের ছাত্ররা নিজেদের প্রতি আস্থাবান ও লক্ষ্যের দিকে যত্নশীল। ফলে সেইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া অনেক সহজ গতিতে চলে। ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে সেখানে স্থান, সুযোগসুবিধা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আনুপাতিকভাবে ভালো। নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাও সহজতর। পরবর্তী সাফল্য অসম্ভব নয় বলে ছাত্র শিক্ষক দু পক্ষই অনেক নিশ্চিন্তভাবে নিজের কাজে নিবিষ্ট থাকে—অনিশ্চয়তায়, অকারণ হীনম্মন্যতায় ভোগে না। ছাত্রকে যেমন ভাবতে হয় না দেশোপ্লিয়নের সাম্রাজ্যবাদ জেনে কী হবে, শিক্ষককেও তেমনি হতাশায় ভুগতে হয় না, সামনে বসা নির্বোধ বা চঞ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে হয় না এখানে শেকসপিয়ার-শেলীর বিশ্লেষণ করা পণ্ডশ্রম, বৃথাই (প্রায়ই ক্লাসগুলিতে দেড়শো-দুশ ছাত্র থাকে অথচ কোনো আধুনিক ব্যবস্থা নেই) গলা ফাটানো ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আজ আমরা সবাই জানি যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি-বিদ্যায় প্রতিদিনই নতুন তত্ত্বের, তথ্যের সংযোজন ঘটছে, পরিবর্তন ঘটছে—যা না জানলে পড়ানো, বিশেষ করে মেধাবী ছাত্রদের পড়ানো, কঠিন। তাই গবেষণা, জ্ঞানের জগতের সঙ্গে সর্বদা পরিচয়রক্ষা সর্বভারতীয় বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি অবশ্য অত দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্যেও একই রকমভাবে নতুন সংযোজন, পুরাতন তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা ঘটছে। কিন্তু যথেষ্ট মোটিভেশনের অভাবে (কী কাজে লাগবে?—এই মানসিকতায়) খুব কম অধ্যাপকই তার নিত্যচর্চা করেন বা অন্তত খোঁজখবর রাখেন। হ্যাঁ, গবেষণা-নামক "মহৎ কেরানিগিরি" একেবারে অজানা নয় এ মহলে, তবে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এম. ফিল, পিএইচ. ডি ইত্যাদি ডিগ্রী লাভের উপায় হিসাবে। অনেকে তো গবেষণা করা আর পিএইচ. ডির জন্য তৈরি হওয়াকে সমার্থক মনে করেন। দর্শন-সাহিত্য ইতিহাসের মূলতত্ত্বগুলি জানা যে প্রত্যেক মানুষের (সে তত্ত্ব পরবর্তী কালে যতই ভুল বলে পরিগণিত হোক) মূলশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, এ কথা সর্বস্বীকৃত। আমেরিকার লিবারেল আর্টসের মডেলে গঠিত আমাদের আই-আই-টির ছাত্ররাও তাই ইউম্যানিটিজের কিছু কোরস

করে। বিজ্ঞানীর শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার জন্য যে কিছু মূল কলা-বিষয় জানা প্রয়োজন, সে কথাই প্রতিফলিত হচ্ছে পাঠক্রমে বিজ্ঞানের পাশাপাশি দর্শন-ইতিহাস-অর্থনীতির স্থান দেখে। তবে এ অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতোই মর্যাদাহীন, এবং গুরুত্বের দিক থেকে ম্লান। কলা-বিষয়ের মূলতত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের মতো দ্রুতগতিতে চলে না বলে প্রবীণ অধ্যাপকের হলদে-হয়ে-যাওয়া নোটও কাজ চালিয়ে নিতে পারে এসব বিষয়ের ক্লাসের কাজে। পাঠ্যক্রমের নানা পরিবর্তন আর একটু-আধটু সংশোধনও তাই কলাবিভাগের বিভিন্ন বিষয়কে নতুন আঙ্গিক দিতে পারে নি। পারে নি যথেষ্ট গভীরভাবে বিষয়টির পুনর্ব্যাখ্যার দ্বারা বিপুল সংখ্যার তরুণমনকে নতুনভাবে চিন্তার খোরাক যোগাতে বা আকৃষ্ট করতে। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে—যেমন ছাত্রমহলে তেমনি অধ্যাপকমহলে। তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। নামী কলেজের সংখ্যালঘু জগৎকে তো এই সংখ্যাধিক্যের যুগে "এলিটিসট" বলে প্রায় অপবাদই দেওয়া হয়। এ মানসিকতা কিন্তু বিপজ্জনক। শিক্ষা বা জ্ঞানের জগতে গুণগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষ দিয়েই মানবিচার বাঞ্ছনীয়, এবং প্রতিভাবান বা গুণবানরা সংখ্যায় কম বলেই কি তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি "এলিটিসট"? জগতে সর্বত্রই প্রতিভা বা বুদ্ধি বিশেষ সম্মান বা সুযোগের দ্বারা সমাদৃত। এ নীতি গণতন্ত্রবিরোধী নয়। রাশিয়াতেও বিশেষ প্রতিভার, ব্যালেশিল্পীদের সম্মান আর সুবিধা অনেকের ওপরে।

শিক্ষার মাধ্যম / ভালো পাঠ্যপুস্তক

আরেকটি সমস্যা হল শিক্ষার মাধ্যম আর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। স্কুলের স্তর থেকেই নানা কারণে সর্বভারতীয় স্তরে বাঙলার ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশ পিছু হটছে আগের তুলনায়। তার একমাত্র কারণ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 'শিক্ষার মান আগের চেয়ে নেমে গেছে', তা নয়। অন্যান্য রাজ্যের মান বেড়েছে তাও হতে পারে। যাই হোক, ইংরেজ যাওয়ার পর জাতীয়তাবাদী মনোভাব বদলে গেছে। সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বর্তমান প্রজন্ম উঠেপড়ে লেগেছে। তাই ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুল গজিয়ে উঠেছে কয়েক বছরে। সনাতন ক্যাথলিক স্কুলগুলি মূলত ক্রিশ্চান ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য শুরু হয়েছিল। সেখানে ভরতির জন্য এখন রীতিমত কঠিন প্রতিযোগিতা। নানা কারণে সরকারি বিদ্যালয়গুলির নিয়মশৃঙ্খলা, পড়ানো ইত্যাদির ওপর অনেকেরই আস্থা কমে গেছে। তা ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যাও খুব কম। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা-মা বেশির ভাগই বেসরকারি ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলে ছেলেমেয়েদের দিতে চান, যাতে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় তারা জয়ী হয়। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আই.সি.এস / আই.এ.এস-দের ছেলেমেয়েরাও সরকারি স্কুলে পড়ত। আজ সেরকম পরিবারের ছেলেমেয়েরা হয় বিদেশী-পরিচালিত স্কুল কিংবা দেশী অথচ ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভরতি হবার চেষ্টা করে। সংখ্যাধিক্যের চাপে সরকারি স্কুলগুলিতে ভরতির জন্য হুড়োহুড়িও কোন অংশে কম নয়। তবে মান আর পছন্দ অনুযায়ী স্কুলগুলি আর প্রথম সারিতে পড়ে না। মাধ্যম-সমস্যা পরে নানা অসুবিধারও সৃষ্টি করে। প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি প্রাধান্য পায় না বটে, পরবর্তী স্তরে কিন্তু ইংরেজি-জ্ঞান নানা বিষয়ে সাহায্য করে। মেধাবান প্রতিভাবান ছাত্রও দেরিতে ইংরেজি শুরু করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে তেমন ভালো করতে পারে না। ভালো কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষাতেও ইংরেজি জ্ঞান সাহায্য করে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজগতের চেহারা লক্ষ করলে দেখা যায়, গত দু-এক দশকে তা কত বদলে গেছে। স্কুলজীবনে যারা ভালো ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলে পড়েছে তারাই পরে যাচ্ছে ভালো কলেজগুলিতে। অবশ্য এরাও অনেকেই প্রথম সারির নির্বাচনের পরবর্তী বাছাই। অন্যদিকে ইংরেজির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় বাদ চলে যাচ্ছে অনেক মেধাসম্পন্ন ছাত্রও। প্রশ্ন হচ্ছে, আগে কী করে বাঙলা মাধ্যমের ছেলেরা ভালো ইংরেজি জানত? আজ কেন নয়? কারণ অনেক—বর্তমান আলোচনার আওতায় তা আনা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে, সেরকম মেধার ছেলেমেয়েরা এখন চলে যাচ্ছে পূর্ববর্ণিত 'ভালো' স্কুলগুলোতে। তা ছাড়া যে-কোনো শিক্ষার মতো ইংরেজি শিক্ষার মানও তেমন নেই, যদিও বহু ছোটো ছেলেমেয়েকেই আজকাল প্রেমেন্দ্র মিত্রের বইয়ের চেয়ে এনিড ব্লাইটন নাম্নী মহিলার 'কারথানা'র তৈরি বইয়ের দিকে ঝুঁকতে দেখা যায় বেশি। ইংরেজি-বাঙলা মাধ্যমের পার্থক্য এক বৈষম্যের পত্তন করেছে ছাত্রজীবনের শুরুতেই।

পরবর্তী সময়ে কলেজেও এর জের চলে যখন তারা একই সঙ্গে পড়ছে। নানাভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক-সামাজিক মর্যাদাও এর সঙ্গে জড়িত। একথা বলাই বাহুল্য যে, ধনী এবং / অথবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত / উচ্চশিক্ষিত পিতামাতার সন্তান যে সুযোগসুবিধা পায়, দরিদ্র এবং / অথবা মধ্য-শিক্ষিত, বা অশিক্ষিত পিতামাতার সন্তান তার নাগাল পায় না। ফলে ধনী / ইংরেজি মাধ্যমে পড়া, উচ্চবিত্ত / উচ্চশিক্ষিত পিতামাতা যার—এসবই সমার্থক হয়ে উঠছে। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে—দরিদ্র বা অল্পশিক্ষিত লোকের সন্তানও মেধার জোরে প্রতিযোগিতার শিখরে রয়েছে—এ ঘটনা বিরল হলেও ঘটতে পারে, তবে তা সংখ্যায় নগণ্য। যদি-বা এমন ঘটে তবে তারাও সমাজের ওপরতলায় ওঠার তাগিদে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস না পড়ে বৃত্তিমূলক বা বিজ্ঞান শিক্ষায় যাবার চেষ্টাই করে প্রধানত। পেছনে পড়ে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কমমেধাসম্পন্ন ছাত্রের দল যাদের জন্য খোলা আছে কলাবিভাগের দরজা।

শিক্ষার মাধ্যমের মতো পাঠ্যপুস্তকের ভাষাও এই "দুই সংস্কৃতি"র বৈষম্য বাড়াতে সাহায্য করছে। শিক্ষার সাফল্যে ভালো বই যতটা সাহায্য করে, আর কিছুই ততটা পারে না। বাঙলায় পড়তে হলে বাঙলায় ভালো বই চাই। বিজ্ঞানও অবশ্য অনেকে বাঙলায় পড়ে, কিন্তু তারা কলা আর বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মতো সংখ্যায় এত বিপুল নয়। কবিতা এবং অন্যান্য সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙলার অগ্রগতি অক্ষুণ্ন থাকলেও, ভাষা আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকর স্তরে তেমন মৌলিক কিছু লেখা হয় নি। এমনকি, স্নাতক আর স্নাতকোত্তর মানের পাঠ্য-পুস্তকও সংখ্যায় তেমন নেই। যা আছে তার মধ্যে উন্নত মানের বইয়ের সংখ্যা কম (বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া)। এখানে একরকম অদ্ভুত উন্নাসিকতা বা লেখক / গবেষকদের মর্যাদাবোধ কাজ করছে। বিভিন্ন কারণে বেশিরভাগ লেখক আর পণ্ডিত গবেষণাভিত্তিক উন্নত মানের বই ইংরেজিতেই লেখেন। হয়তো প্রকাশকের তাগিদ, সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভের বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান পাওয়ার আশাতেই তাঁরা ভারতীয় ভাষায় লেখেন না। ফলে, সেই একই ছবির ভিন্নরূপ দেখি। ভালো বই, মৌলিক গবেষণার সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাদেরই যারা সহজে ইংরেজি পড়তে পারে, অর্থাৎ ইংরেজি-মাধ্যমে বা অন্তত ভালো স্কুল-কলেজে পড়া ছাত্ররা। অন্য পক্ষে বাঙলায় যে বই লেখা হচ্ছে না তা নয়—পরিমাণগতভাবে প্রচুর বইই লেখা হচ্ছে—কারণ তার বাজারই তো সংখ্যার দিক থেকে অনেক বড়ো। গাদাগাদি করে স্নাতক কলেজ-গুলিতে যারা ভিড় জমায় তারাই এসব বই কেনার জন্য দোকানে লাইন দেয়। কলেজের লাইব্রেরিতে এসব বইয়ের চাহিদা এত বেশি যে যথেষ্ট নিম্নমানের বইও সংখ্যায় প্রচুর রাখতে হয়। নিছক সিলেবাস অনুযায়ী কিছু তথ্য পাশের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয় এসব বইয়ে। তথ্যও যে সব সময় নির্ভুল থাকে তা নয়, ভাষাও বহু সময় স্পষ্ট নয়, বিশ্লেষণও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাসাভাসা বা অন্যান্য বইয়ের ভাষান্তর মাত্র। মৌলিকতার ছিটেফোঁটাও থাকে না যাতে লেখকের নিজস্বতা ফুটে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ অবশ্য এই ঘাটতি পূরণের কাজে সচেষ্ট হয়েছেন, যদিও তাঁদের চেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নতুন-নতুন চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। সেই দরজাই যদি ছাত্রজগতের বিরাট এক অংশের কাছে বন্ধ রইল, তবে কলেজ পড়া ডিগ্রী লাভের একটা উপায় ছাড়া আর কিছুই হল না। সে ডিগ্রীরও এখন কানাকড়ি দাম। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, চাকরি নিতে গেলে এখন এইসব ডিগ্রীধারীদের তাদের নিজস্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। শুধু যে কম প্রেসটিজিয়াস স্নাতক কলেজগুলির ছাত্রদেরই এই ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হয় তা নয়, ছাকনিতে ছাকা নামী প্রতিষ্ঠানের স্নাতকদেরও নানারকম অসম্মানজনক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় শিক্ষা-প্রাপ্ত যুগে। সে কথায় পরে আসছি।

সর্বভারতীয় এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধে বিজয়ী ছাত্রদল যখন ইনজিনীয়ারিং / মেডিক্যাল কলেজ-গুলিতে পড়া শুরু করে, তখন শুধু তারা নয়—সামাজিক-ভাবে তাদের পরিবারের সকলেও সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠেন। এ সম্মান এতই লোভনীয় যে সর্বভারতীয় (এবং আঞ্চলিক) স্থান অধিকার দিয়ে প্রার্থীর পাঠ্য বিষয় পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ কোনো ছাত্রের ইলেকট্রনিকস প্রথম পছন্দ হলেও সে যদি "ভালো" প্রতিষ্ঠানে সিভিল ইনজিনীয়ারিং বিভাগের জন্য নির্বাচিত হয়, তাতেও রাজি হয়ে সে সেখানেই যায়। এমন একটি মেধাবী ছাত্রকে প্রশ্ন করি, 'তুমি তো অমুক স্থানীয় কলেজে ইলেকট্রনিকস পেয়েছিলে, সেখানে ইলেকট্রনিকস না পড়ে অতদূর যাচ্ছ কেন সিভিল ইনজিনীয়ারিং পড়তে? তোমার

তো ইলেকট্রনিকস পড়ারই ইচ্ছে ছিল।' 'না, কানপুর আই. আই. টি-র প্রেসটিজই আলাদা'—উত্তর পাই। লক্ষণীয় বিষয় হল, এইসব কলেজে এবং ইনজিনীয়ারিং / টেকনোলজির মধ্যেও আবার মেধার সঙ্গে বিষয়নির্বাচনের স্তরভেদ আছে। প্রায় একই মেধার বিভিন্ন ছাত্রের স্বাধীনতা নেই বিষয়নির্বাচনের। অর্থাৎ আগ্রহ, ইচ্ছা, প্রবণতা নয়, লিখিত পরীক্ষার মাপকাঠি দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় কে কী বিষয় পড়বে। এ স্তরবিন্যাসের রীতি জানা থাকলে একনজরেই বোঝা যাবে এক ছাত্রের বা পরবর্তী কালে এক প্রার্থীর মেধা কেমন।

এই চিত্র অপেক্ষাকৃত নতুন, পঁচিশ বছর আগেও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রথম সারির ছাত্ররা ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস, অঙ্ক পড়েছে—পরবর্তী জীবনে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।

শিক্ষা আর শিক্ষণের পর্যায়ে এত ঝাড়াই-বাছাই-এর পর মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, এই ছাত্রের দল মসৃণ গতিতে সমাজের উঁচুতলায় মর্যাদার শিখরে উঠবে সহজেই; জ্ঞান আর প্রতিভার দীপ্তিতে স্বীকৃতি লাভ করবে সবার কাছে। হায়! বাস্তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ঘটে না। শৈশব থেকে বহু পরীক্ষা / প্রতিযোগিতায় উঁচুস্থান পেয়ে, বহু পরিশ্রম করে অনেক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখে কর্মজীবনে অনেকেই কোনো বিশেষ সম্মান পায় না। সম্প্রতি এম. টেক ডিগ্রীকে চাকরির ন্যূনতম যোগ্যতা করার প্রস্তাবে * আই. আই. টি. স্নাতকরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছে। তাদের ক্ষোভের কারণ এই যে, সাধারণ কলেজের স্নাতক ডিগ্রী এবং তাদের বি. টেক ডিগ্রীকে এক পর্যায়ে বিচার করা ঠিক নয়। সাধারণ স্নাতক ও বি. টেকধারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে—এম. টেককে এম. ফিল এর মতো রিসারচ ডিগ্রী বলে ধরা উচিত ইত্যাদি। বি. টেক পেতেই তাদের অনেক পরিশ্রম আর সময় লাগে, এর ওপর এম. টেক-এর মতো উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন সাধারণ শিল্প-উদ্যোগে হয় না। শুধু শিক্ষকতা ও গবেষণাগারের কাজের জন্য উচ্চতর ডিগ্রীকে ন্যূনতম যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হোক। শুধু তাই নয়। কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ইনজিনীয়ারিং কলেজের (যেখানে মোটা টাকা দিয়ে ভরতি হওয়া যায়) স্নাতকরাও প্রায় একই পর্যায়ে বিবেচিত হয়। ডিপ্লোমাধারী ইনজি-নীয়ারও কোথাও-কোথাও একই স্তরে বা উঁচুপদে কাজ করে। তাছাড়া 'সিঙ্গল লাইন প্রমোশন' নীতি থাকলে অভিজ্ঞতার জোরে ইনজিনীয়ারকে ইনজিনীয়ার নয় এমন ব্যক্তির অধীনেও কাজ করতে হতে পারে। এইসব সমস্যা বা বিক্ষোভের ব্যাপারটি কতদূর যুক্তিসঙ্গত তা হয়তো তর্কসাপেক্ষ; কিন্তু একটি তথ্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে, তা হল—আই. আই. টি. প্রতিষ্ঠান (বা অন্য কোনো সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান) ভরতির সময় এবং পাঠকালীন তাদের ছাত্রকে যে বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত করে—পরবর্তী সময়ে তা ম্লান হয়ে যায় বা কেউ বিশেষ মনে রাখে না। শিল্প আর প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন-নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই মেধাবী স্নাতকের অনেকেই শেষ পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোগের জাঁতাকলে অর্ধ-শিক্ষিত লাভলোলুপ মালি-কানার কাছে নিজ প্রতিভাকে মোটা দামে বিক্রি করে দেয়। হুকুম-তামিলের পাথরে ক্ষয়ে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিনে-দিনে ভোঁতা হয়ে ওঠে স্বাধীন চেষ্টার অভাবে। অনেকে আবার সরকারি আমলাতন্ত্রের জটাজাল ভেদ করে পাঠ্য-ক্রমে শেখা বিদ্যা, নতুন তত্ত্ব প্রয়োগের সুযোগ পায় না। বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত থেকে এসে সরকারি গতানুগতিকতায় হতাশ হয়, পরিবর্তন আনতে গিয়ে নানা বিরোধিতার দেওয়ালে মাথা ঠোকে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাধায়, সুযোগের অভাবে ছাত্রজগতের মুকুটমণি ওপর থেকে মন্ত্রীর চাপে, নীচের থেকে কর্মচারীদের কর্মবিমুখতায় নিজের প্রতিভার বিশেষ কোনো স্বাক্ষরই রাখতে পারে না তার কাজের জগতে। শিক্ষকতায়, গবেষণাকেন্দ্রে যে অল্পসংখ্যক মেধাবী তরুণ যায় তারা মুষ্টিমেয়। অন্য পেশার চেয়ে স্বাধীনতা এখানে বেশি, তবে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব বলে ব্যাপকভাবে বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে আকর্ষণ করতে পারে না। তা ছাড়া, সংখ্যায় এ ধরনের পদ কম বলে পাওয়াও কঠিন। অনেকে আবার বেশি লোভনীয় পদে যাবার আগে বা না পেয়ে বাধ্য হয়ে এ পথে আসে। ফলে দু-চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষক / গবেষকই কিছুটা নৈরাশ্যভাবাপন্ন।

সর্বভারতীয় বিভিন্ন চাকরির প্রতিযোগিতামুলক

---

* **দি স্টেটসম্যান** পত্রিকার ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সম্পাদকীয়, এবং মার্চ ৬, ৮, ৯ তারিখের চিঠিপত্র-গুলি দ্রষ্টব্য। উক্ত প্রস্তাব শ্রী হিতেন ভায়ার একটি রিপোর্টে করা হয়েছে।

পরীক্ষাগুলিতে বরং ইনজিনীয়ারিং / ডাকতারি / বিজ্ঞান-এর সঙ্গে কলা / বাণিজ্য বিভাগের ছাত্ররা সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামে। বহু ক্ষেত্রে এমনও হয় যে সেই পেছনের সারির কলার ছাত্ররা উচ্চ পদ অধিকার করে আই. আই. টি স্নাতকের ওপরওয়ালা হয়ে বসে। পরীক্ষায় কৃতিত্বের অতিরিক্ত গুণ, অর্থাৎ সপ্রতিভ ব্যবহার আর কথাবার্তা, চেহারা, ব্যক্তিত্ব, বিশেষ কোনো নৈপুণ্য (খেলা, বিতর্ক, কুইজ ইত্যাদি), পারিবারিক পরিচয় থাকলে তো অনেক সময় বহু বেসরকারি সংস্থায় অত্যন্ত সাধারণ ছাত্রের পক্ষেও মর্যাদাসম্পন্ন পদে যাওয়া বিচিত্র নয়।

শৈশব থেকেই উদ্যত পরীক্ষা-চাবুক

সম্প্রতি ইনজিনীয়ারিং স্নাতকরা আর-একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে। অনেক বড়ো-বড়ো সংস্থা তাদের নিয়োগ করার আগে নিজস্ব পরীক্ষায় যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছে। ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র স্নাতকদের জন্যই যে অসম্মানজনক তা নয়, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করে। উচিত-অনুচিতের কথা (কারণ যে-কোনো মালিকই যে-কোনো প্রার্থীকে নির্বাচন না করতে পারে) বাদ দিলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—নানা নির্বাচনের কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে মেধাবী ছাত্ররা কতটা সম্মান, মূল্য আর মর্যাদা পায়? আর অন্যদের তুলনায় যদি তা নিশ্চিত সাফল্যের আশা এবং / অথবা উচ্চ মর্যাদার বা প্রতিভা বিকাশের সুযোগের ভরসা না দেয়, তবে কেন অথথা এই প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়? মেধাবী শিশুর মনে শৈশব থেকে উচ্চাশার বীজ বুনে দেওয়ার হয়তো কিছু ভালো ফল আছে, কিন্তু আনন্দ? প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ক'টা ছেলেমেয়ে আগেকার প্রজন্মের ছাত্ররা ঢিলেঢালা জীবনে যেমন সাহিত্য, কবিতা, মার্কস, রাসেল, সার্ত্র নিয়ে আলোচনা করত, পড়ত, ভাবত, অকারণ তর্কে মাতার খুশিতে ভরে থাকত তা পারে? সময় নেই—নেই অপচয় করার মতো মুক্ত অবসর। পঁচিশ বছর আগেও এই কলকাতাতেই বিজ্ঞান, ইনজিনীয়ারিং, মেডিক্যালের ছাত্ররাও সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, দেশী-বিদেশী ফিল্ম নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় মাততে। আজকের মেধাবীরা পোস্টাল কোচিং, বাড়ির টিউটর, বিভিন্ন প্রবেশ-পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নাজেহাল। কমিকস্ বা 'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ' আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লঘু বা উত্তেজক কিছু সস্তা সাহিত্য পড়ে তারা, যা সময় বা মনোযোগ কিছুই দাবি করে না বেশি। ফলে ইংরেজি বলতে-বা-পড়তে-পারা ছাত্রের অনুপাত বাড়লেও দুর্ভাগ্যবশত তারা বেশিরভাগই সিরিয়স সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। ইংরেজি মিডিয়মের ঢেউ আসার আগের যুগে বরং বলতে না পারলেও পড়ার চল ছিল অনেক বেশি। এখন যারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে তারা বেশিরভাগই ওই কলা-বাণিজ্য বিভাগের ছাত্ররা।

কুইজের আসরে চটপট উত্তর দেওয়ার চল দেখে মনে হতে পারে আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি জানে। তবে এসব জানারও আবার মেড-ঈজি আছে, যা পড়লে বিষয়টি গভীরভাবে না জেনেও সঠিক উত্তর শেখা যায়—হাততালি পাওয়ার জন্য যা যথেষ্ট। কিন্তু তাতে জ্ঞানের বা মননের উন্নতি হয় না। মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশ ঘটে না। এমন জ্ঞান নির্ভুল হলেও তা থেকে আলো ছড়ায় না চারিদিকে।

শিক্ষার মান উন্নত করা যেমন প্রয়োজন (শুধু কতজন স্নাতক হচ্ছে তা নয়), তেমনি প্রয়োজন মানসিক আর বুদ্ধিগত উৎকর্ষের উন্নতি। ভ্যালু টীচিং প্রোগ্রাম দেখে মনে হয় এন সি ই আর টি এ বিষয়ে সচেতন। কিন্তু শুধু স্থূলপাঠ্যক্রমে নীতিশিক্ষার প্রবর্তনই ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত মননশীলতায় সাহায্য করতে পারে না। তার জন্য চাই মানসিকতার পরিবর্তন। পরীক্ষায় (সে পরীক্ষা আবার নির্দিষ্ট সিলেবাসে, নির্দিষ্ট সময়ে দিতে হবে) সাফল্যই যে বুদ্ধিমত্তার একমাত্র মাপকাঠি নয়, একথা উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র ভরতির জন্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠানগুলি নানারকম পরীক্ষা করতে পারে—কারণ স্থানের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু নামকরা পত্রিকায় যখন দেখি স্কুলের প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকা আর 'ফার্স্ট বয়'-এর সাক্ষাৎকার 'কী করে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়' সে সম্বন্ধে, তখন আশ্চর্য লাগে। শিক্ষাজীবনের উদ্দেশ্য কি তাহলে কী করে নম্বর বেশি পাওয়া যায় (বা পরীক্ষায় ভালো করা যায়) তাই ই—কী করে বিষয়টি ভালো ভাবে জানা যায়, তা নয়? স্কুলকলেজে ছাত্রদের 'রেজাল্ট' নিয়ে আলোচনা হয়, ভালো করলে গর্ববোধও হয়, কিন্তু নিয়মিত শিক্ষকশিক্ষিকারা কি আলোচনা করেন কিভাবে ছাত্ররা আরো ভালো করে বিষয়টি বুঝতে পারবে, জানতে পারবে? নম্বর দিয়ে 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' শ্রেণীভেদ, স্থান-অধিকার—এইসব প্রথা যতদিন বহাল থাকবে, চাহিদা-সরবরাহনীতি অনুযায়ী বিজ্ঞান / কলার এই শ্রেণীভেদও ততদিন থাকবে, যদি না আমাদের মনোভাব বদলায়। অর্থাৎ ভালো ছাত্ররা যদি উপলব্ধি করে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসে দক্ষতা অর্জনও সহজ নয়, এবং সম্মানজনক; আর বিজ্ঞান-ইনজিনীয়ারিং ইত্যাদি পড়লেও মন্থর ভবিষ্যৎ বা সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত নয়, তবেই এই মেরুর ব্যবধান কিছুটা দূর হতে পারে। এ ব্যবধান এখন এমন মারাত্মক রূপ নিয়েছে যে প্রবেশ-পরীক্ষায় অসফল ছাত্রেরা শুধু নয়, তাদের পরিবার পর্যন্ত হতাশায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। ছাত্রেরা, বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা—সবাই যদি একথা উপলব্ধি করেন যে, ভালো ছাত্র মাত্রেই বিজ্ঞান পড়ার অধিকারী এবং দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস খোলা আছে নীচের সারির জন্য—এ ধারণা ভ্রান্ত, এবং পরবর্তী জীবনে সাফল্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুনিশ্চিত নয়, তবেই 'দুই সংস্কৃতি'র এই দূরত্ব ঘুচে যেতে পারে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রসঙ্গে

রণেন্দ্রনাথ দেব

প্রয়াত হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে দুটি কারণে দ্বিধা বোধ করি। প্রথম কথা, এতে অনিবার্যত আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, হেমাঙ্গবাবু কয়েকটি কথা আমায় বলেছিলেন যা লিপিবদ্ধ করলে অনেকের মর্মপীড়া ঘটবে। তবু, সত্যের অনুরোধে কথাগুলো বলা দরকার।

হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় উনিশ শো একচল্লিশ সালে একটি কৌতুককর ঘটনার মধ্য দিয়ে। তখনো কমিউনিসট পার্টি বৈধ হয় নি। হেমাঙ্গবাবু আত্মগোপন করে ছিলেন। সবাই জানতেন হেমাঙ্গবাবু গুরুতর অসুস্থ। সে সময় আরেকজন আত্ম-গোপনকারী কমরেড মারা যান, কিন্তু রটে যায় হেমাঙ্গবাবুই মারা গেছেন। শ্রীশ্যামাধন সেনগুপ্ত হেমাঙ্গবাবুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য তাঁর "শিখা" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা বার করেন; আমি তাতে হেমাঙ্গবাবুর সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি। পরে প্রকৃত ঘটনা জানা গেলে আমরা কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকি। ইতিমধ্যে কমিউনিসট পার্টি বৈধ হলে পার্টির কর্মীরা সিলেট শহরে তেলিহাত্তর পাড়ায় একটি বাসাভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন। হেমাঙ্গবাবুও কিছু-দিনের মধ্যে সেখানে আস্তানা গাড়েন। একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি অত্যন্ত লজ্জিতভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হই। তখন আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর সামনে দাঁড়াতে কুণ্ঠা বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে প্রথম দিনই ভয় ভেঙে যায়, এবং এর পর থেকে তাঁর কাছে হাজির হতে ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে কখনো সংকোচ বোধ করি নি। সেদিনের কথাগুলি স্পষ্ট মনে পড়ে। তিনি বিশেষভাবে খোঁজ নিয়েছিলেন আমার বাবার। আমার বাবা স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ দেব ছিলেন কংগ্রেস নেতা এবং আসাম বিধানসভার সদস্য। হেমাঙ্গবাবু মিরাশি গ্রামের এক জমি-দার-বংশের সন্তান। মিরাশি আমার বাবার মামার বাড়ি। ছোটোবেলায় পিতৃহারা হবার পর বাবা কিছুদিন মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে-

স্মৃতিচারণ

ছিলেন। সেই সুবাদে মিরাশির সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। হেমাঙ্গবাবু বলেছিলেন, বাবার সঙ্গে তিনি নওগাঁ জেলে ছিলেন অনেক দিন, এবং বাবার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত। বাবাও হেমাঙ্গবাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বলা চলে, বাবার সূত্রে আমি হেমাঙ্গ-বাবুর স্নেহ অর্জন করি।

হেমাঙ্গবাবু সব সময় সিলেট শহরে না থাকলেও উনিশ শো চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত তাঁকে আমরা খুব কাছে থেকে দেখেছি। অনেক কাজে তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তাঁর নির্দেশে উদ্যোগী হয়ে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ গড়ে তুলেছিলাম। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় সিলেটে গেলে হেমাঙ্গবাবু আমায় ভার দেন মানিকবাবুকে শহর দেখাতে। মানিকবাবুকে আমাদের কলেজে নিয়ে গিয়ে বড়ো একটি সভার আয়োজনও করেছিলাম। সিলেট শহরে গণনাট্য সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করে হেমাঙ্গবাবু তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন, এবং শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম প্রধান পুরুষ। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন তখন কবি অশোকবিজয় রাহা। কত তরুণকে তিনি আকৃষ্ট করে গণ-নাট্য সংঘের অঙ্গনে টেনে এনেছিলেন! এঁদের মধ্যে দুজন পরে কলকাতায় চলে গিয়ে সংগীত - এবং চিত্রজগতে খ্যাতিমান হন।

ক্রমে বৃহত্তর কর্মজগতের টানে হেমাঙ্গবাবু দূরে চলে যান। তাঁর সঙ্গে আর নিত্য যোগাযোগ ছিল না। মাঝে-মাঝে চিঠিপত্র দিয়েছেন। কলকাতায় বেশ কয়েকবার দেখাও হয়েছে। সাহিত্য অকাদেমি-আয়ো-জিত এক সভায় তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম। তখন বোধহয় জরুরি অবস্থা চলছে। হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিজের আসনে ফিরে গিয়ে দেখি কাগজপত্রে পূর্ণ আমার ফাইলটি রহস্যজনকভাবে উধাও। সাহিত্য অকাদেমির কর্মীরা কিছুক্ষণ পরে গোবেচারা চেহারার একটি লোকের কাছ থেকে ফাইলটি উদ্ধার করেন। সে নিরীহভাবে দর্শকের আসনে বসেছিল। পুলিসের চরের নিরীহতা অবশ্যই ছদ্ম। ফাইল খুলে দেখি ওই সভায় যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি সবই সে এরই মধ্যে নোট করে ফেলেছে! হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে আরেকদিন দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল তাঁর নাকতলার বাড়িতে। শেষ দেখা হয় চুরাশি সালে আগরতলায়। একটি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর দল নিয়ে গিয়ে-ছিলেন গান গাইতে। অনুষ্ঠানের শেষে মঞ্চে গিয়ে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ছেলে ও মেয়েকে প্রথম কথা জিজ্ঞেস করে-ছিলেন—ওরা সিলেটি ভাষা জানে কিনা। সেই শেষ দেখা।

তাঁর দুয়েকটি উক্তি আজ মনে পড়ছে। সোভিয়েত দূতাবাসে তাঁর কর্মজীবন সুখের হয় নি। বলেছিলেন,

'শুনলে আশ্চর্য হবে, ওদের কমরেড বলে ডাকলে ওরা খুশি হতো না। একটা কাচের পাত্র ভেঙে ফেলেছে বলে বেয়ারাকে প্রহার করেছে ঠিক আমাদেরই আমলাদের মতো। যে প্রেসে কাজ দেওয়া হবে তার মালিকের কাছে প্রকারান্তরে ঘুষ চাওয়ার দৃশ্যও দেখেছি।'

সে তুলনায় তাঁর চীনবাসের অভিজ্ঞতা ছিল সুখের। তিনি বলেন,

'মাও তাঁর জীবদ্দশায়ও পার্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান নি, শুধু অসাধারণ শক্তিবলে পার্টিকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন।'

শেষের জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছেন প্রাক্তন সহকর্মীদের কারো-কারো আচরণে। ক্ষমতাসীন হবার পর এদের স্বভাবের নীচতা আর লোভ ঘৃণ্য মূর্তি ধরে বেরিয়ে আসে। কমরেড যখন মন্ত্রী হয়ে তাঁকে লোভ দেখিয়ে-ছেন সরকারি অর্থের বিনিময়ে তাঁর দলকে গান গাওয়ার সুযোগ দেবেন, আবার মতভেদ হওয়ায় সে আমন্ত্রণ বাতিলও করেছেন মন্ত্রীমশাই, হেমাঙ্গ-বাবু তাঁর ক্রোধ আর অশ্রদ্ধা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সক্ষোভে আমায় বলেছিলেন, 'আমি ভাতের অভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি নি।'

হেমাঙ্গবাবুর চরিত্রের ঋজুতা এবং স্পষ্টতা সবারই জানা। আমি তাঁর স্বভাবের আর-একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব। শিল্পের ক্ষেত্রে হেমাঙ্গবাবু ছিলেন দলনিরপেক্ষ। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকে লক্ষ করেছি—গোঁড়ামি ছিল না তাঁর। হেমাঙ্গবাবু কবিগানের ভক্ত ছিলেন। সিলেটে তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন নলিনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক। কর্মজীবনে নলিনীবাবু হেডমাস্টার হলেও মনেপ্রাণে ছিলেন "কবিওয়ালা"। হেমাঙ্গবাবু নলিনীবাবুর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিগান নিয়ে আলোচনা করতেন। সিলেটে আরেকজন প্রসিদ্ধ কবিগায়ক ছিলেন প্রসন্নকুমার চন্দ। হেমাঙ্গবাবু এঁকেও বিশেষ সম্মান করতেন। প্রসন্নবাবু অবসরপ্রাপ্ত দারোগা। কিন্তু কবিগানে তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বস্বীকৃত। সম্ভবত চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালে কলকাতা থেকে কোনো বামপন্থী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমকালীন শ্রদ্ধেয় কবিগায়ক রমেশ শীল, শেখ গুমহানী প্রভৃতির একটি জীবনকথা সংকলিত হয়। ওই বইয়ে প্রসন্নকুমার চন্দের জীবনকথা লিখেছিলেন হেমাঙ্গবাবু। প্রসন্নকুমার চন্দের ছেলে প্রণয়কুমার চন্দের বাড়িতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন হেমাঙ্গবাবু। প্রণয়বাবু কংগ্রেসকর্মী ছিলেন, পরে কাছাড় জেলা সংগ্রেসের সম্পাদক হন। হেমাঙ্গবাবুর কাছে এঁরা সবাই প্রিয়জন।

তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে এই নির্মলতাও আমাদের অভিভূত করে-ছিল। শেষ জীবনে জোর গলায় বল-তেন, গণসংগীত মানে হাত মুঠো করে গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচানো নয়। তা শিল্প এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পের মতোই সূক্ষ্ম ভাব-সম্পদে পূর্ণ। এ-ও সেই গোঁড়ামিমুক্ত মনের প্রকাশ।

হেমাঙ্গবাবুর মৃত্যুর পর একটি বড়ো আশ্রয়স্থলের অভাব বোধ করি। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সাহসী, দূরদ্রষ্টা। এমন একজন নির্ভীক কবি সমর সেন চলে গেলেন। হেমাঙ্গ-বাবুও বিদায় নিলেন।

বামপন্থী সাহিত্যচেতনা এবং মধ্যবিত্ত

অভিজিৎ করগুপ্ত

বামপন্থী সাহিত্যের অবয়ব আর চরিত্র নিয়ে পৃথিবীর দেশে-দেশে এযাবৎ কম আলোচনা বা বিতর্ক হয় নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে "চতুরঙ্গ" পত্রিকার জানুআরি, ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী পুলকনারায়ণ ধরের "শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব ও বামপন্থী সাহিত্যচেতনা" শুধুমাত্র একটি প্রবন্ধের শিরোনাম নয়—এ এক বহু-আলোচিত এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক-বিষয়। বিভিন্ন সময়ে, ততোধিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসঙ্গটির এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে, এ নিয়ে নতুন করে কিছু লিখতে গেলেই থমকে দাঁড়াতে হয়। প্রশ্ন জাগে—যা লিখব তা কি বহুবার, বহু-ভাবে, বহু মানুষের কণ্ঠ আর কলম থেকে নির্গত বা নিঃসৃত হয় নি? সম্ভবত এই কারণেই গোটা বিশ্বেই আজ এ ধরনের বিতর্কের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অবলুপ্ত না হলেও ইদানীং আমাদের দেশে বামপন্থী সাহিত্যসংক্রান্ত বিতর্ক বা আলোচনা কদাচিৎ চোখে পড়ে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পত্রপত্রিকায় যেসব লেখালেখি প্রকাশিত হয় এই বিষয়কে কেন্দ্র করে, সেগুলির অধিকাংশই চর্বিতচর্বণ ছাড়া কিছু নয়। পুলকবাবুর প্রবন্ধও সীমাবদ্ধতার ওই চক্রব্যূহ থেকে মুক্তি পায় নি। প্রায় ছ-পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে পুলকবাবু যা বলতে চেয়েছেন খুব সংক্ষেপে তাকে দুটি অংশে বিন্যস্ত করা যায়—(১) বামপন্থা ও বামপন্থী সাহিত্যের রূপরেখা, এবং (২) এদেশে বামপন্থী সাহিত্যচেতনা এবং অনুশীলনের সীমাবদ্ধতা। শিরোনামে 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব' বাক্যাংশটি সংযোজিত থাকলেও তা নিয়ে বিশদ কোনো বিশ্লেষণের দিকে এগোন নি লেখক।

বর্তমান নিবন্ধে সব-কটি বিষয় নিয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনার কোনো তাগিদ অনুভব করছি না। বরং আসুন, আমরা দ্বিতীয় অংশটির দিকে চোখ ফেরাই—যেখানে পুলকবাবু ভারতবর্ষের বামপন্থী রাজনীতি আর সাহিত্যের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও পেটিবুর্জোয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শঙ্কিত হয়েছেন; শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে মধ্যবিত্তের সৃষ্ট সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ সবই পুরোনো প্রশ্ন, কিন্তু পুলকবাবুর উপস্থাপনার দোষে—বা গুণে—এই বহু-আলোচিত প্রসঙ্গটিতেই এক ধরনের সমকালচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এ লেখায় পুলকবাবুর প্রবন্ধের ওই বিশেষ ক্ষেত্রটির উপরই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে সফল করার পেছনে সাহিত্যের স্থান কোথায়, চরিত্রগত দিক দিয়ে এই সাহিত্যের কতটা স্লোগানধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এর শিল্পমনস্কতাই বা কতটা জরুরি—এসব প্রশ্নের সঙ্গেই কিছুটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শিল্পীর শ্রেণীমানসিকতার দিক। এ সবই মৌল প্রশ্ন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এদের বিশ্লেষণ করতে বসলে 'বিপ্লব' ব্যাপারটিকেই একটা বিরাট এবং সর্বাত্মক বিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে হবে। বিপ্লব একটা ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাহায্যে সামাজিক

ঘটনাপ্রণালীকে ব্যাখ্যা করার মধ্যে এক ধরনের বিপদজনক ঝুঁকি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজবিপ্লবকে রসায়ন-শাস্ত্রের অন্যতম প্রক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রাসায়নিক পরিবর্তনের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, এর সাহায্যে সমাজ-বিপ্লবের ধারণাকে কত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সংজ্ঞানুযায়ী, যে স্থায়ী পরিবর্তনে পদার্থের অণুর গঠন পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন সংযুক্তিবিশিষ্ট এবং ভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকেই রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। সকল বিপ্লবের আগের আর পরের সমাজকাঠামোর কথা ভাবলে একই চিত্র ফুটে উঠবে আমাদের সামনে। এই কারণেই বিপ্লবকে একটি সমাজের রাসায়নিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করলে ভুল হয় না। এবার এই পরিবর্তন বা বিক্রিয়ার চরিত্রের দিকে তাকানো যাক। প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে যথাযথ-ভাবে সম্পন্ন করার পেছনে কিছু বিশেষ শর্ত থাকে। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় বিভিন্ন রকম 'শর্ত' প্রয়োগ করা হয়। কোথাও বা বিকারক পদার্থগুলি ছাড়াও তৃতীয় কোনো পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন। এরা বিক্রিয়ার রি-এজেনট। কোথাও বা এরা অনুঘটকের কাজ করে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে বিক্রিয়ায় যুক্ত না হয়েও বিক্রিয়ার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজপরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ভাবে কিছু শর্ত বা রি-এজেনটের প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব বলেই যে এই বিপ্লবে সমাজের অন্য কোনো শ্রেণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অথবা প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে না, এ চিন্তা একেবারেই অমূলক। বস্তুত সমাজবিপ্লবকে সার্থকতায় পৌছতে বেশ কিছু শর্তের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ কাজে শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার যেমন প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রকেও সুনিয়ন্ত্রিত কায়দায় ব্যবহার করার। এখানে এসেই আমরা মুখোমুখি হই বৈপ্লবিক অথবা বামপন্থী সাহিত্যের রূপরেখা সংক্রান্ত গভীর প্রশ্নের। মধ্যবিত্তের কলম থেকে বেরিয়ে আসা সাহিত্যে বৈপ্লবিক বা বামপন্থী চেতনার যথার্থ বিকাশ ঘটতে পারে কিনা, তা নিঃসন্দেহে বিতর্কের বিষয়। ভারতবর্ষের বামপন্থী সাহিত্যচেতনায় মধ্যবিত্ত মানসিক-তার উপস্থিতি পুলকবাবুকে ব্যথিত করে—করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মার্কস, এঙ্গেলস থেকে শুরু করে আজকের বহু বিপ্লবী তাত্ত্বিক নেতাই মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে বার-বার সোচ্চার হয়েছেন। আসলে এটাও এক ধরনের মধ্যবিত্ত মানসিকতা। বস্তুত আর কোনো শ্রেণীই অন্তত তত্ত্বগত দিক দিয়ে সমাজের এই অতি সংবেদনশীল শ্রেণীটিকে এত তীব্রভাবে আক্রমণ করে নি—যতটা করেছে মধ্যবিত্ত নিজেই। এর পেছনেও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। আর কোনো শ্রেণীর মধ্যেই এত ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন চরিত্রের মূল্যবোধের সমাবেশ ঘটে নি। এইসব মূল্যবোধের কোনোটি আপসমুখী—ব্যক্তিস্বার্থেরসংকীর্ণতায় নিমগ্ন, কোনোটি অতিবৈপ্লবিক চিন্তায় আচ্ছন্ন, আবার কোনোটি বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সমাজ-ঐতিহাসিক চেতনায় সমৃদ্ধ। এদের টানাপোড়েনে মধ্যবিত্তের মধ্যে জন্ম নেয় এক ধরনের দোদুল্যমানতা। স্ববিরোধের যন্ত্রণায় ক্লান্ত মধ্যবিত্ত তাই মাঝে-মাঝেই লিপ্ত হয় এক বিচিত্র আত্মদংশনে। বিচিত্র এই কারণেই যে, আর কোনো শ্রেণীই ঠিক এভাবে আত্মধিক্কারের পথে যায় না। শ্রেণী-চেতনা সেখানে অপেক্ষাকৃত সরল। মধ্যবিত্তের শ্রেণী-মানসিকতার এই সীমাবদ্ধতা তথা সংকীর্ণতার যথার্থ রূপ এবং পরিধি নিয়ে কম গবেষণা হয় নি। কার্ল মার্কসেরও একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী-চরিত্র ছিল। আজ পর্যন্ত কোনো মার্কসবাদীকেই এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় লিপ্ত হতে দেখি নি। অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। বিক্ষিপ্তভাবে যেটুকুও বা হয়েছে তাতে যুক্তির বদলে গোঁড়ামিই স্থান পেয়েছে বেশি। যে পরিমাণ ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রয়োজন এ কাজে, তা যে গত একশ বছরের মধ্যে মার্কসবাদী শিবিরে আসে নি, তা তো নয়। আর অমার্কসবাদী বা মার্কসবাদবিরোধী ধারাগুলি তো ব্যক্তিগত চরিত্রহননেই সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গটি উঠলেই এঁরা হাত বাড়ান 'ফ্রেডি ডিমুথ' অধ্যায়টির দিকে। হয় এঁরা দু দলই ব্যাপারটির গভীরতা অনুধাবন করেন নি, অথবা করলেও এড়িয়ে গেছেন। বস্তুত কার্ল মার্কসের শ্রেণী-চরিত্রকে যথার্থ সততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে পারলে বহু অমীমাংসিত এবং বিতর্কিত প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যেত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কিছুটা কারবনের বহুরূপতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। একই মৌল কারবন পরমাণুবিন্যাসের তারতম্যের জন্য কখনো কয়লা, কখনো গ্রাফাইট, কখনো বা হীরক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও ঠিক একই ভাবে কয়লা, গ্রাফাইট আর হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে নিঃসন্দেহে কয়লার পরিমাণই বেশি, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গরিষ্ঠ অংশটিই সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। এখন প্রশ্ন হল—এহেন মধ্যবিত্তের মধ্য থেকে উঠে আসা লেখকের গল্প, উপন্যাস, কবিতা অথবা প্রবন্ধকে শ্রমিকশ্রেণী তার বিপ্লবে কাজে লাগাতে পারে কিনা। অবশ্যই পারে। শুধু মধ্য-বিত্তের সাহিত্য নয়, চেতনা এবং মননের সব কটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণীকে অ-বিপ্লবী বা অ-কমিউনিসট বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রিত কায়দায় ব্যবহার করা উচিত। এবং তা বিপ্লবের স্বার্থেই। সন্দেহ নেই অন্তত আমাদের দেশে এইসব বুদ্ধি-জীবীদের গরিষ্ঠ অংশটি শ্রেণীগত দিক দিয়ে অবশ্যই মধ্যবিত্ত। এদের দোদুল্যমানতার যে উপাঙ্গটি অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর সমাজচেতনায় ঋদ্ধ, শ্রমিকশ্রেণীকে প্রায় মন্থনের মতোই তাকে বের করে আনতে হবে—প্রয়োগ করতে হবে বিপ্লবের বৃহত্তর আঙিনায়। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের একটি তাৎপর্যময় ভূমিকা আছে। বামপন্থী সাহিত্যচেতনা মানেই শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্ট সাহিত্য নয়। মধ্যবিত্তের কলম থেকেও অতি সফলভাবেই এ ধরনের সাহিত্য বেরিয়ে আসতে পারে; স্ফুরণ ঘটতে পারে প্রকৃত বামপন্থী সাহিত্যচেতনার। শেক্সপিয়ার, বালজাক, তলস্তয়ের উপমা মার্কসবাদী এবং অমার্কসবাদী উভয় দলই

এতবার ব্যবহার করেছেন যে সেগুলি আজ কিছুটা ভাঙা রেকর্ড বাজাবার মতো শোনায়। রবীন্দ্রনাথের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। ভদ্রলোককে যে এদেশের তথাকথিত বিপ্লবীরা কোথায় রাখবেন, কিভাবে রাখবেন—সেই চিন্তাতেই দিশেহারা হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সহজ কথাগুলোকেই তাই বার-বার মন্ত্রের মতো জপ করতে হয়। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত শ্রেণীভুক্ত না হয়েও মধ্যবিত্তরা যে বিভিন্ন সময় বহু বৈপ্লবিক রচনা প্রসব করেছেন বিশ্বসাহিত্যে তার ভুরি-ভুরি নিদর্শন আছে। মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকের সৃষ্ট রচনা সব সময়ই তার নিজ শ্রেণীর সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত—এরকম ভাবনা এক ধরনের অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া কিছু নয়। আসলে দোদুল্যমান এই শ্রেণী থেকে আগত যে কোন লেখকও নিজ শ্রেণী এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের মতোই বিভিন্ন রকম সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে—থাকাটাই স্বাভাবিক। লেখালেখি ছাড়াও তার জীবনের একটা বিরাট অংশ ক্রমাগত আহরণ করে চলে রকমারি অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় তার সজ্ঞা ও প্রজ্ঞার নির্যাস। ফলত যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তা যে সব সময় তার নিজ শ্রেণীর আঙিনায় সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। অনেক সময়ই তার অভিজ্ঞতার বিরাট ক্ষেত্র জুড়ে থাকে মেহনতি মানুষের যন্ত্রণার পটভূমি। এসব ক্ষেত্রে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে মধ্যবিত্ত-সৃষ্ট বলে উড়িয়ে দেওয়া অন্যায়।

মানুষের শ্রেণী-পরিচয় তার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের মানদণ্ড। জীবনপ্রবাহের প্রতিটি স্রোতকেই ওই একই মানদণ্ডে বিচার করা নিঃসন্দেহে এক ভ্রান্ত প্রবণতা। শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিবাদ তথা বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে কী ধরনের সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা অবশ্যই আলোচনার বিষয়। কিন্তু তাই বলে কোনো বাঁধাধরা সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টাও ঠিক নয়। ভাবা উচিত নয় যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই এ ধরনের সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে। যে কোনো সৎ সাহিত্যিকই তাঁর সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হবার সময় শ্রেণী-পরিচয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করে যান। শুধু সাহিত্য নয়, শিল্পসংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। আর ঠিক এই কারণেই মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত একজন লেখকের সাহিত্যসম্ভার অনেক সময়ই যথার্থ বৈপ্লবিক আদর্শের ধারক হয়ে ওঠে।

মতামত

কেন টিউটোরিয়াল ?

আজ থেকে বিশ-তিরিশ বছর আগে বিদ্যালয়ে এমন সব ছেলেদের আসতে দেখেছি যারা সত্যিসত্যিই পড়তে চায়—পড়ার জন্য পড়তে চায়। আজকের দিনে এই উদ্দেশ্যে পড়ুয়ার সংখ্যা ক্ষীয়মাণ। আজকের ছেলেদের মধ্যে ফলনির্দেশক (score-oriented) পড়াশোনা করার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। নিজের যোগ্যতা অনুসারে সর্বাপেক্ষা বেশি ফল অর্জনের দিকেই লক্ষ্য থাকে। বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী নৈপুণ্য বিকাশের দিকে লক্ষ্য দেওয়া বাস্তব কারণে অসম্ভব—বিশেষত যখন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা অধিক। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার লক্ষ্য ছাত্রদের মনে এই নতুন অভীপ্সা তীব্রতর করে তুলেছে। সেই জন্যই শ্রেণীকক্ষের পাঠ ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে উঠছে না। দেখা যাচ্ছে, যুগোপযোগী প্রয়োজনের খাতিরে বর্তমান দিনের পরিস্থিতিতে একজন সুশিক্ষকের নিকটও একজন ছাত্র বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বাঞ্ছিত শিক্ষা আশা করতে পারছে না। অনেক বিদ্যালয়েই দেখেছি, আজকের দিনে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ করে টিউটোরিয়াল করানোটা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, ছাত্র-শিক্ষকের আনুপাতিক হারের, এবং ছাত্র আর শ্রেণীকক্ষের সংখ্যার আনুপাতিক হারের উদ্বেগজনক অসাম্য বৃদ্ধি।

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যাবে, আজকের বাস্তব অবস্থায় বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে ঘষা-মাজা করে তোলবার জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আর অস্বীকার যায় না। সমষ্টিগতভাবে পড়াতে গেলে বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের মধ্যে তো কিছু ফাঁক থেকেই যায়। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন যুগে এই 'ফাঁক' ভরানোর ব্যবস্থা হয়েই আসছে। আজকের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে এই ব্যবস্থা সার্বজনীন হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে কিছুটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, এই শূন্যতা ভরাট করার জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাচ্ছে। এই দিকটির কথা চিন্তা করলে কোচিং-এর সব দোষই ক্ষমা করা যায়। বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে না। যদি কোনো দোষ থাকে তবে সেটা বিদ্যালয়ের পাঠদানের উপকরণের মাধ্যমের মধ্যে নিহিত। জাতীয় চাহিদা পূরণ করে একদিক দিয়ে কোচিং সংস্থাগুলো একভাবে জাতির সেবা করে চলেছে।

কোচিংগুলির ব্যবসায়িক সাফল্যের সাথে-সাথে কোচিংগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে আবিলতা বাসা বেঁধেছে। কিন্তু এই দেখে সিদ্ধান্ত বোধহয় গ্রহণ করা উচিত হবে না যে প্রতিটি কোচিং-ই 'ঘুঘুর বাসা'।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে একটা কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, একই শিক্ষার জন্য সমান্তরালভাবে দুটো ধারার প্রবর্তন জাতীয় শ্রম আর বিনিয়োগের একটা বিপুল অপচয়। অনেকটা মধ্যস্বত্বভোগীদের মতো একটা শ্রেণী উৎপন্ন হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলি সত্যকারের বিদ্যালয় হয়ে উঠুক—এ প্রার্থনা সবার সঙ্গে আমার। মূলকে শক্ত করে বাঁধন দিলে এসব পরিকাঠামো আপনি সাপের খোলসের মতো ঝরে পড়বে। এ ব্যাপারে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব : (ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন করে কাজের দিন বাড়ানো। (খ) সকল প্রকার অসুবিধা দূর করে বিদ্যালয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাসের পুনঃপ্রবর্তন করা।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কদমতলা। হাওড়া ৭১১ ১০১